শেষ কোথায়

ভিজিএফ কার্ডের চাল তুলতে লাইন হয় এটা অমলেশ ভেবে ভেবে আকুল। ও মনে করে ওর চেয়ে গরীব লোক বাংলাদেশে আর কেউ নাই। কারণ অমলেশের ছয়টি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছোট ছেলে বিমল, মেয়ে বিমলা আর স্ত্রী ভাস্বতী রাণীকে নিয়ে তার ছোট্ট সংসার। তার অন্যান্য ছেলেরা বিয়ে করে যার যার মতো সংসার পেতেছে। তাদের থেকে কিছু প্রত্যাশা করতে পারেনা অমলেশ। কারণ তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করতে পারেনি সে। এখনকার সময়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েই মানুষ সেই ছেলেমেয়ের থেকে কামাই খাওয়ার আশা করেনা। আর অমলেশ তো তার কিছুই করেনি। তাই তার ছেলেদের কাছে তার বাড়তি কিছু চাওয়ার নেই। যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন যেন সুস্থ্য থাকতে থাকতে যেতে পারে। যেন বিছানায় ভুগতে না হয় মনে প্রাণে চায় সে। কিন্তু দারিদ্রতার ঘানি টানতে টানতে আর পেরে ওঠেনা তার বুড়ো শরীর। কত রকমের কার্ড এসেছে দেশে। ভিজিএফ কার্ড, পোয়াতি কার্ড (গর্ভবতী কার্ড), বয়স্ক কার্ড, মুক্তিযোদ্ধা কার্ড। সব কার্ডের নামই মানুষের মুখে মুখে শুনে অমলেশের মুখস্থ হয়ে গেছে। লেখাপড়াও জানে সে। সেই সময়কার এইট পাশ। ইংলিশ ভাল জানে। কিন্তু কোন চাকরী বেশী দিন সে করতে পারে নাই। কারণ সরকারী অফিসে কাজ করতে গিয়ে সে নিজেকে আর সবার সাথে মানিয়ে নিতে পারে নাই। সবাই যখন লুটে পুটে খেতে ব্যস্ত। তখন সে দেশ, মাটি আর মানুষের হিসেব নিয়ে ব্যস্ত সময় পাড় করেছে। সে তখন ভেবেছে একাত্তরের যুদ্ধের কথা। আজকের এই লুটেপুটে খাওয়ার জন্যই কি সেদিন সেই যুদ্ধে জীবন মরণ পণ করে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? অমলেশ হারিয়ে যায় একাত্তর সালের ৭ মার্চ ভাষনের সেই সময়ে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ চলছে রেডিওতে। আর গায়ের রক্ত যেন উম্মাদনায় দুলছে। যেন এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে অমলেশ। বাড়ী এসে দেখতে পায় বাবা, ভাই ও তাদের বউয়েরা সব তলপি তলপা গুছিয়ে নিয়ে পথ নেমেছে। তা দেখে খুবই অবাক হয় অমলেশ। বাবার বরাবর প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, কোথায় যাচ্ছো বাবা? শান্ত গলায় অমলেশের বাবা ভবতোশ উত্তর দেয়, দেখছিস না দ্যাশের কি হাল? চল সবাই যখন ভারতে যাচ্ছে আমরাও চলে যাই। দ্যাশের অবস্থা ভাল হলে তখন চিন্তা ভাবনা করে দেখা যাবে। অমলেশ এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকায়। স্থীর চোখে চোখ রাখে ওর বাবার দিকে। সে চোখ বড্ড শান্ত কিন্তু কঠিন। ও জানে ওর বাবা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাই-ই হবে। তাই ঘাড়ের গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে, তোমরা যাও বাবা আমি আর আমার বউ যাবোনা। রক্ত রাঙা চোখে দেউড়ির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অমলেশ। ভবতোশ শেষবারের মতো অমলেশের মাথায় হাত রেখে বলে, দেখ সময় খুবই অল্প। চল আমরা সবাই মিলেমিশে এক জায়গা থাকবো। বাঁচলে একসাথে বাঁচবো মরলে একসাথে মরবো। আর তাছাড়া তোর বউ এখন পোয়াতি। তোর উচিৎ তার মুখপানে চেয়ে হলেও এখান থেকে চলে যাওয়া। অমলেশ ভাস্বতী রাণীর দিকে তাকিয়ে বলে, এই দ্যাশ আমার মা। এই মাটি আমার মা। আমার মায়ের বুক ছেড়ে আমি কোথাও যাবোনা। বাঁচলে মায়ের বুকে মাথা রেখেই বাঁচবো না হয় মায়ের বুকে মাথা রেখেই মরবো। আমি পারবোনা সৎ মায়ের ছাঁয়াতলে নিজেকে সমর্পণ করতে। তোমরা চলে যাও। আর ভাস্বতী যদি যেতে চায় তোমাদের সাথে ওকে নিয়ে যাও। কথাগুলো বলে ছলছল চোখে তাকায় ভাস্বতীর দিকে। ভাস্বতী অতি কষ্টে অমলেশের কোল ঘেঁষে দাঁড়ায় এবং বলে, বাবা তোমরা যাও। অনেকটা পথ তোমাদের যেতে হবে। তবে যাওয়ার আগে তোমার উত্তরসূরীকে আশির্বাদ করে যাও যেন ওরা স্বাধীন দ্যাশের বুকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে। ভবতোশ তার বড় ছেলে বউয়ের মাথায় হাত রেখে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। কিন্তু সে কাঁন্না দীর্ঘ হওয়ার আগেই মেঝবউয়ের তাড়ায় কাঁন্নার সমাপ্তি ঘটে। বাবা, আপনি না হয় শুধু আপনার বড়ছেলে আর বড়বউয়ের সাথেই থাকুন। আমাদের কথা আপনাকে ভাবতে হবেনা। এমনতর কথায় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা। অমলেশের মাথায় হাত রেখে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে ভবতোশ আর বলতে থাকে, অমলরে তুই আমার বড় সন্তান। আজ তোকে রেখে আমার ছোটগুলোর মুখপানে চেয়ে তোকে বর্গীর হাতে রেখে গেলামরে বাপ। যদি পারিস তোর এই অক্ষম বাপটাকে ক্ষমা করে দিসরে বাপ ক্ষমা করে দিস।

কালক্ষেপন না করে সবাই একে একে তলপি তলপা, কাঁসার বাসন কোসন, বিছানা-পত্র যা যা নেওয়ার মতো ছিল সব নিয়ে চললো পশ্চিম দিকে উদ্দেশ্য প্রাগপুর বর্ডার। যেতে যেতে সবাই পিছন ফিরে দেখলো একবার করে অমল আর ভাস্বতীকে। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল দৃষ্টির অগোচরে। বারান্দার বেড়ার সাথে হেলান দিয়ে দুচোখের পানিতে বুক ভাসায় অমলেশ। সেই দিনের সেই স্মৃতি আজও অমলেশকে তাড়িয়ে ফেরে। সেই যে বেদনা বিধুর বিদায় মুহূর্ত। তা আজীবন বয়ে বেড়াবে অমলেশ। আজ এই সত্তরে

এসেও মনে হয় এইতো সেদিনের ঘটনা। বাস্তবে ফিরে এসে দেখতে পায় ভিজিএফ কার্ডের লাইনের মাথা ক্রমশঃ বড় থেকে আরও বড় হতে চলেছে। সাপের মতো এঁকেবেঁকে বড়ছোট মাঝারি সব রকমের মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কতক্ষন ধরে চাল দেবে তা কে জানে। কোমড় থেকে আজিজ বিড়ির প্যাকেট বের করে পাশের এক ছেলের বয়সীর কাছ থেকে আগুন চেয়ে নিয়ে বিড়ি ধরায় আর বিড়বিড় করে বলে, আরে বাবা রোদির কে তেজ! মনে হচ্ছে রোদির তেজেই সবকিছু পুড়ায়ে মেসেকার করে দিবি। অমলেশ'র যতগুলো গুন আছে তার মধ্যে এই একটা গুন যা হলো যেকোন পরিবেশে সে তাকে মানিয়ে নিতে পারে। লেখাপড়া জানা লোক হলেও সাধারন মানুষের সাথে ঠিক সাধারণ ভাবেই মেশে। তাদের মতো করেই কথা বলে। আবার একটু উচ্চ শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলার সময় সেই উচ্চ শ্রেণীর লোকের মতো শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে। দ্বিতীয় গুনটি হলো সে আগাগোড়া সৎ। তার ধর্ম হলো, না খেয়ে থাকবো কিন্তু মিথ্যা বা জোচ্চুরি করে খাবোনা, মানুষকে ঠকিয়ে খাবোনা। তাই সে শুধু পানি আর বিড়ি খেয়ে বেঁচে থাকার এক মহা অভ্যাস গড়ে তুলেছে। তার কথা, বিড়ি আর পানি খাও ক্ষুধা কম লাগবে। কারণ ধুমপান করলে এমনিতেই ক্ষুধামন্দা রোগ হয়। হঠাৎ একজন কোর্ট টাই পরা ভদ্রলোক এসে অমলেশকে উদ্দেশ্য করে বলল, কি খবর অমলদা ভাল আছোতো? জবাবে অমলেশ নির্মল হাসি উপহার দিয়ে বলল, জ্বী দাদা ভগবান ভালই রেখেছেন। লোকটা চলে যেতেই আবার কোথায় যেন হারিয়ে যায় অমলেশ।

অমলেশের বাবা ও তার ভাইয়েরা যাওয়ার পর খুবই একা হয়ে পড়ে অমল। সারা হিন্দুপাড়া খা খা। কেউ কারো খোঁজ নেবার মতো নেই। শুধুমাত্র আব্দুল মাবুদ অমলেশের সাথে যোগাযোগ রাখে। খোঁজখবর নেয়। কখনও চাল, ডাল, ম্যাচ, কেরোসিনের তেল। কখনও গম, বার্লি , সুজি দিয়ে আসে। কখনওবা ময়দা। এভাবেই সখ্যতা গড়ে ওঠে আব্দুল মাবুদের সাথে। ওরা দুজন পোড়াদহ একসাথে যায় লুঙ্গী বিক্রি করতে ট্রেনে করে। মাঝে মাঝেই ওদের সাথে মিলিটারির দেখা হয়ে যায়। আব্দুল মাবুদের কাছ থেকে আগেই পাক কালেমা শিখে নিয়েছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কথায় কথায় আলহামদুলিল্লাহ। খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ জিকির করা। সব সবই শিখে নিয়েছিল অমলেশ। কারণ অমলেশ যেকোন পরিবেশ মোকাবিলা করার জন্য মানসিক ভাবে খুবই পরিপক্ক ও প্রস্তুত ছিল।

একদিনের ঘটনা। কুমারখালী রেলষ্টেশন থেকে তারা দুজন ট্রেনে উঠলো। উদ্দেশ্য কুষ্টিয়া কোর্ট ষ্টেশন। ট্রেন আলাউদ্দিন নগর ছেড়ে ঠিক যেই মূহুর্তে কয়ার ব্রীজের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ ট্রেন থেমে গেল। ট্রেনের বিভিন্ন বগি থেকে বেছে বেছে লোক নামানো হচ্ছে। তা দেখে আব্দুল মাবুদ ও অমলেশ একে অপরের দিকে তাকালো। দুজনের চোখে রাজ্যের ভয় জমা হয়েছে। পাক মিলিটারী ওদের কামরায় প্রবেশ করলো। একে একে সবাইকে কালেমা পড়ার জন্য বলতে লাগলো। যারা কোন রকম কোন বাধা বিঘ্নতা ছাড়া বলতে পারলো কালেমা। তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলো। আর যারা বলতে গিয়ে জড়িয়ে ফেললো তাদেরকে পিঠমোড়া করে ট্রেন থেকে নামানো হলো। পর্যায়ক্রমে অমলেশে'র পালা। অমলেশ স্পষ্ট ও দ্রুততার সাথে কালেমা বলে দিল। কিন্তু আব্দুল মাবুদ ভয়ে গুলিয়ে ফেললো। নামানো হলো আব্দুল মাবুদকে। অমলেশ নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলো আব্দুল মাবুদের মুখপানে। সবাইকে লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে। ফায়ার করবে এমন সময় একজন বিহারী এসে কয়েকজনকে সে লাইন থেকে বের করে দিলো। তার মধ্যে আব্দুল মাবুদ ও ছিল। কারণ ঐ বিহারী আগে থেকেই আব্দুল মাবুদকে চেনে। বহুবার বিহারীর কাছে থেকে কেরোসিন তেল, জিড়ে, ম্যাচ ও লবন এনেছে। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষন থেকে আব্দুল মাবুদ ফিরে আসাতে খুশি আর উচ্ছ্বাসে অমলেশ আব্দুল মাবুদকে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ফেলে। তা দেখে বিহারী আব্দুল মাবুদের কাছে জানতে চায় সে কাঁদছে কেন? এবং কি হয়? আব্দুল মাবুদ জবাব দেয় আমার আপন ছোট ভাই। আমাকে লাইনে দাঁড় করানো দেখে ভয়ে কেঁদে ফেলেছে। এই ঘটনার পর থেকে অমলেশ আর আব্দুল মাবুদ দুই দেহ এক আত্মা হয়ে যায়। অমলেশ'র নামও দেয় আব্দুল মাবুদের ভাই আব্দুল সাবুদ। জুন মাসে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। অমলেশের বউয়ের বাচ্চা হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আব্দুল মাবুদের ভাই সাবুদ সেজে সেও ব্যবসা শুরু করলো। কেরোসিনের টিন কুষ্টিয়া থেকে এনে কুমারখালী, খোকসা, পাংশা ষ্টেশনে বিক্রি শুরু করলো। যার ফলে বিহারীর সাথে গভীর সম্পর্ক হয়ে গেল দুজনের এবং বেশ বিশ্বস্তও হয়ে উঠেছে দুজন। এভাবে মাসখানেক কেটে গেল। সেই মুহূর্তে আজকের এই কোর্ট টাই পরা ভদ্রলোক সারাদিন গ্রামের মধ্যে নেংটো হয়ে ঘুরে বেড়াতো। বয়স তখন কতইবা হবে? বড়জোর সাড়ে চার কিংবা পাঁচ। অথচ আজ সে তার বুকে মুক্তিযোদ্ধার ব্যাচ লাগিয়ে ঘোরে। মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পায়। স্বাধীনতা দিবসে বিজয় দিবসে সরকারী দাওয়াত পায়। আর অমলেশ; যখন পোয়াতি বউকে

ঘরে রেখে আব্দুল মাবুদের ভাই আব্দুল সাবুদ সেজে দেশের ক্রান্তিলগ্নে বেনাপোল থেকে ট্রেনিং নিয়ে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহন করলো। যুদ্ধের মধ্যে থেকেই তার বউয়ের সন্তান হওয়ার খবর জানতে পারলো তবুও সন্তানের মুখ দেখতে আসার সময় পেলোনা। বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা বুলেট তার বাম পা এফোড় ওফোড় করে দিলো। তবুও সে আজ মুক্তিযোদ্ধা না। কারণ তার কোন মুক্তিযোদ্ধা সনদ নেই। বাঃ বাহ বাহরে আমার বাংলা মা। কি চমৎকার নিয়ম নীতি আজ তোমার বুকে।

একে একে সাতটি সন্তানের জনক হয়েছে অমলেশ। দেশকে সে শত্রূ মুক্ত করতে পেরেছে ঠিকই; কিন্তু দারিদ্রমুক্ত করতে পারেনি তার ছোট্ট পরিবারকে। ছোট ছেলে বিমলের কি এক সমস্যা প্রায় প্রায়ই পেটের ব্যথায় সারা বাড়ী মাথায় করে ফেলে। ভাস্বতী রানীরও পেটে সমস্যা। ডাক্তার দেখাতে দেখাতে আর ঔষধ খাওয়াতে খাওয়াতে অমলেশ আজ নিঃস্ব। ডাক্তারের কাছে গেলেই এই টেষ্ট সেই টেষ্ট। হাবিজাবি দিয়ে ভরে রাখে। ঔষধ যে কয় টাকার তারচেয়ে ঢের বেশী টেষ্ট ফেষ্ট করানোর টাকা। দেখা গেল টেষ্ট করতে যেখানে খরচ পঁচিশ'শ টাকা সেখানে ঔষধ খরচ মোটে পাঁচশ টাকা। ঘরে ঔষধের বোতল আর খোলের জন্য এখন ঘর দিয়ে সারাদিন ডিসপিনসারি ডিসপিনসারি গন্ধ বের হয়। অমল সত্যিই আর পেরে ওঠেনা। এদিকে বিমলা বিবাহ উপযুক্ত। একটা মাত্র মেয়ে। তাকেও লেখাপড়া শেখাতে পারেনি। দারিদ্রতার কষাঘাত সামলাতে সামলাতেই বিমলার বয়স পঁচিশ ছুঁই ছুঁই করছে। অথচ আজ অবধি একটা সম্বন্ধ যোগাতে পারলোনা যৌতুকের টাকার অভাবে। বাহারী সব টাল বাহানা ছেলের বাপেদের। সোনা দশ ভরি, মোটরবাইক, ফ্রিজ। বলি তোর ছেলেকে তুই খাইয়ে পড়ায়ে মানুষ করেছিস আমি কি আমার মেয়েকে খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করিনি? প্রশ্নটা মাথায় আসতেই অমলেশ স্তব্ধ হয়ে যায়। কারণ সে তার মেয়েকে কয়দিনই বা ঠিকমতো খাবার দিতে পেরেছে? পারেনিতো। পড়াতেও পারেনি। ভাবনা বাদ দিয়ে মনোযোগ সহকারে বিড়িতে টান দেয় অমলেশ। খুক খুক করে কাশি উঠে তার। হঠাৎ সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যেই। তারপর কি হয় অমলেশ আর বলতে পারেনা। যখন জ্ঞান ফেরে তখন সে নিজেকে দেখে একটা দোকানের মধ্যে। উপস্থিত সবাই তার মুখপানে চেয়ে আছে। হঠাৎ একটি ছেলে পাশ থেকে বলে উঠলো, এখন কেমন লাগছে কাকা বাবু। হ্যাঁ সুচক মাথা নেড়েই তাড়াহুড়ো করে উঠে বসে আর বলে, চাল দেয়া কি শেষ হয়ে গেছে? মুখে এক বিষন্নতার ছাঁয়া পড়ে তার। কেউ একজন বলে ওঠে, অমলদা চিন্তা করোনা তোমার চাল আমরা উঠায়ে এনেছি। মুখে খানিকটা হাসির রেখা টেনে বলে, ভগবান তোমার মঙ্গল করুক ভাই। চালের ব্যাগটা নিয়ে হিসেব মিলাতে মিলাতে বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় অমলেশ। এই বারো কেজি চাল মানে হচ্ছে আটচল্লিশ পোয়া। প্রত্যেক অক্তে যদি দুইপোয়া করে রাঁধা যায় তাহলে হবে..... চব্বিশ অক্ত। তার মানে হচ্ছেগে প্রতিদিন দুইবেলা। তাহলে হবে বারো দিন। হিসাব মিলাতে মিলাতে বাড়ী এসে চাল মেপে দেখে মাত্র নয় কেজি। অথচ সরকার বরাদ্দ করেছে বারো কেজি। কার কাছে আর নালিশ দেবে অমলেশ? নিরীহ মানুষ যার কাছে সব নালিশ পেশ করে তার কাছেই অমল আর্জি করলো, হা ভগবান এদের তুমি বিচার করো। বউকে ডেকে নিয়ে বলে, এই যে নয় কেজি চাল এ দিয়ে দিন পনের পাড় করা যাবেনা? ভাস্বতী রাণী অসহায় স্বামীর মুখপানে চেয়ে বললো, তা পাড় করা যাবে ; তুমি তো আর ভাত খাওনা। সারাদিন তো জল আর বিড়ি, বিড়ি আর জল। কথাটা শুনে অমলেশ শেষ কবে ভাত খেয়েছিল সে হিসেব মিলাতে থাকে। যতদূর মনে পড়ে সতের দিন আগে বিশ্বাস বাড়ীতে মউতে (মানুষ মারা গেলে যে খয়রাত অনুষ্ঠান হয়) খানা খেয়েছিল। যদিও গরুর গোস্ত ছিল। তবুও অমল কিছু মনে করেনা। কারণ, আগে জীবন তারপর ধর্ম। জীবনই যদি না থাকে ধর্ম দিয়ে সে কি করবে। কারণ যুদ্ধের সময় কতকিছু খেয়েছে সে আব্দুল সাবুদ সেজে। ভাত খেতে পাবে ভেবে অমলেশ মনে মনে খুব খুশি হয়; যাক আজ কয়টা ভাত খাওয়া যাবে। আলু ভর্তা ভাত রান্না হয় সে রাতের মতো। চরম প্রশান্তিতে সে ভাত খায় আর ভগবানের কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, হা ভগবান বহুদিন বাদে তুমি আমাকে ভাত খাওয়ালে।

দুদিন বাদে খবর পায় অমল; তার মেয়ে বিমলাকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে। ঘরে তো চাল ঠনঠনাঠন ঠন। কি করবে ভেবে পায়না সে। তাই সব ছেলেকে একত্রে ডেকে বলে, আগামীকাল পাত্রপক্ষ বিমলাকে দেখতে আসবে। আমার তো কোন সামর্থ্য নেই। তোমরা কে কতটুকু কি করতে পারো আমাকে বলো। পাঁচ ছেলে একে অপরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। হঠাৎ বড় ছেলে নিখিলেশ বলে উঠলো, বাবা আমাদের অবস্থা তুমিতো জানোই। তবুও আমরা তরি তরকারী যা লাগে তার ব্যবস্থা করবো। তুমি চালের ব্যবস্থা কর। অমলেশ তার ছেলেদের আর কিছু বলতে পারেনা। সত্যিইতো তাদের তো করার মতো কিচ্ছু নেই। সারাদিন তারা হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটে। কেউ

ভ্যান চালায়। কেউ ইটভাটায় কাজ করে। কেউ পরের বাড়ী কামলা দেয়। তাদেরওতো সন্তান সন্ততি আছে। তাদেরওতো ভবিষ্যত দেখতে হবে। তাদের খাওয়া পরার ব্যাপারটা চালাতে হবে। সবকিছু ভেবে চিন্তে বলল, আচ্ছা তাহলে ঐ কথায় রইলো, আগামীকাল তোমরা তোমাদের মতো করে সব এনে তোমার মায়ের কাছে দিও। আর বউমাদের বলো তোমার মায়ের কাজে যেন সাহায্য সহযোগীতা করে। ছেলেরা সবাই যে যার কাজে চলে গেল। ভাস্বতী রাণী স্বামীর খুব কাছে এসে মাথার পাকাচুলের মধ্যে আঙ্গুল বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, তুমি যে উনাদের আসার কথা বলে দিলে আর ছেলেদেরও বাজার সদাই করার কথা বললে। চাল কোথায় পাবে শুনি? অমলেশ কোমড় থেকে বিড়ি বের করে তাতে আগুন লাগাতে লাগাতে বলল, ঐতো ঘরেতো আছেই।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবকিছু আয়োজন করা হলো। পাত্রপক্ষ পাঁচজন মিলে বিমলাকে দেখতে এসেছে। পাত্রপক্ষ বিমলাকে দেখে পছন্দও করলো। কিন্তু যাওয়ার সময় বলে গেল, আমাদের চাওয়া পাওয়ার কিছু নাই। ছেলের একটা মোটর সাইকেল, আর কিছু নগদ টাকার ব্যবস্থা করলেই হবে। আর আপনাদের মেয়ের যা দিবেন তা আপনার মেয়েরই থাকবে। যদি রাজি থাকেন তাহলে আমাদের জানাবেন। আমরা পাঁজি দেখে একটা দিন নির্ধারণ করবো। অমলেশকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সেদিনের মতো আত্মীয়রা চলে গেল ঠিকই কিন্তু পরবর্তী দিনগুলোর খাবার ব্যবস্থা আর রইলোনা অমলের। এদিকে ভাস্বতী রাণীর অবস্থাও করুন। এখন মরে তখন মরে অবস্থা। কোন উপায়ান্তর না দেখে অমল বসতভিটার সাথে লাগোয়া জমিটা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিল এবং ছেলেদের জানালো। তার সন্তানদের কোন ওজর বা আপত্তি আছে কিনা জানতে চাইলো। তারা কোন আপত্তি জানায় না; যেহেতু বোনটাকে বিয়ে দিতে হবে। জমিজমা বিক্রি করে পাত্রপক্ষের চাহিদা মতো সবকিছুর ব্যবস্থা করে পাত্রপক্ষকে জানানো হলো। তারা একটা দিন নির্ধারণ করে বিমলাকে বউ সাজিয়ে তাদের ঘরে তুলে নিল। কিন্তু যৌতুকের কিছু টাকা বাকী রাখা হলো। কারণ ভাস্বতী রাণীর চিকিৎসা বাবদ বেশ কিছু টাকা দরকার। এবং এও জানিয়ে দেয়, বকেয়া টাকা আগামী ছয় মাসের মধ্যে পরিশোধ করে দেবে। একথাতেই রাজি হয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়।

ভাস্বতী রাণীকে ভাল ডাক্তার দেখানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার দেখে শুনে বেশ কিছু টেষ্ট দিলো যাতে প্রায় হাজার দশেক টাকা ফুরিয়ে যাবে। এবং এও বলেছে ডাক্তার রোগীকে ভারতে নিয়ে যেতে। তা শুনে অমলেশ ক্ষেপে গিয়ে বলতে থাকে, তোরা কিসের ডাক্তার কিসের ডাক্তার? রোগ বালাই অসুখ বিসুখ যদি পরীক্ষা করতে না পারিস, রোগীর শারীরিক অবস্থা থেকে যদি তার পথ্য না দিতে পারিস, তাহলে তোদের এমবিবিএস পাশ কি করে হয়? আর কথায় কথায় যদি চিকিৎসা নিতে বাইরের দ্যাশে যাতি কবি তালি তোরা এই দ্যাশে ক্যা??? অমলেশ শেষ কবে রেগে কথা বলেছিল মনে করতে পারছেনা। প্রচণ্ড হাফাচ্ছে। কাঁপতে কাঁপতে সবার অলক্ষ্যে বের হয়ে যায় ডাক্তার চেম্বার থেকে। ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ি বের করে আগুন লাগায়। অমল নিজের কাছে প্রশ্নগুলো পুনরায় ছুঁড়ে দেয় কিন্তু কোন সদুত্তর পায়না অমল। অবশেষে রাজশাহী নিয়ে গিয়ে ভাস্বতী রাণীর জড়ায়ূ নাড়ীর অপারেশন করানোর ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু ব্যথা কমেনা। সবাই বলতে থাকে, অপারেশনের ব্যথাতো আরও বেশ কিছুদিন থাকবে। তবে চিন্তার কিছু নাই ঠিক হয়ে যাবে। ছোটছেলে বিমল এসে মায়ের কাছে বসে আস্তে আস্তে বলতে থাকে, মা সবাই বলছে তুমি নাকি খুবই তাড়াতাড়িই ভাল হয়ে যাবে। ভাস্বতী রাণী খুব কষ্টে মুখে হাসির রেখা টেনে বলে, হ্যাঁরে বাপ তাইই যেন হয়। প্রায় সাথে সাথেই বিমল বায়না করে, মা তুমি সুস্থ্য হয়ে উঠলেই কিন্তু আমরা দিদিকে দেখতে যাবো। সেই কবে দিদি বিয়ে হয়ে গেছে। একবারও এলোনা। এমনকি তোমরাও দেখতে গেলেনা। হঠাৎ বিমলার কথা মনে পড়ে যেতেই ভাস্বতী রাণী চোখের জল লুকাতে বিমলকে বুকের মাঝে চেপে ধরে। আর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যথা শুরু হয়। আগের চেয়ে বেশী বেশী ব্যথা করতে থাকে।

এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। কিন্তু ভাস্বতী রাণী পেটের ব্যথা দিনকে দিন বাড়তেই থাকে। অতঃপর বাদ বাঁকী টাকা পয়সা গুছিয়ে ধার দেনা করে চিকিৎসার জন্য ঢাকা নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে বোঝা গেল অপারেশনের একটা যন্ত্র নাকি ভাস্বতী রাণীর পেটের মধ্যে এতদিন ছিল। তাই-ই এই ব্যথা। অমলেশ এহেন কথা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। এ কোন দেশে বাস করছি আমরা?

ভাস্বতী রাণী আগের চাইতে এখন বেশ ভাল। চলাফেরা ভাল ভাবেই করতে পারে। কাজেকর্মে গতি এসেছে। ছোট ছেলে বিমলের শরীরটা আজ কদিন

খুবই খারাপ। তার মধ্যে বায়না ধরেছে দিদিকে দেখতে যাবে। কারণ মানুষ যখন অসুস্থ্য হয় তখন তার মাথার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি চিন্তায় শুধু ঘুরপাক খেতে থাকে। আর তাই ভাস্বতী রাণী অনেক কিছু করেও বিমলের মাথা থেকে বিমলাকে দেখতে যাওয়ার কথাটাকে ভুল করাতে পারছেনা। মাঝে মাঝে সারারাত চিৎকার করে ঘুমাতে দেয়না। আজ একটু শান্ত আছে। ওদিকে বিমলার শ্বশুড় বাড়ী থেকে টাকার চাপ আসছে। কি করবে কোন গত্যন্তর নাই অমলের। আর যার কারণেই বিমলের ইচ্ছাটাও পূরণ করা যাচ্ছেনা। ক্লান্ত চোখে ঘুম নেমে আসে অমলের। কতক্ষন ঘুমাইছে তার ঠিক নেই। হঠাৎ লোকজনের শোরগোলে অমল ধচমচিয়ে উঠে বসে। ধাতস্থ্য হয়ে বুঝতে পারে ছোট ছেলে বিমলের অবস্থা খারাপ। তাড়াহুড়ো করে ভ্যান ঠিক করে ডাক্তারের বাড়ী উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু ডাক্তার রোগীর অবস্থা দেখে বলে, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল গ্রাম থেকে ৫ কিলোমিটার দুরে। সেখানে নিয়ে যেতে যেতে সকাল আটটা বাজে। হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারকে পাওয়া গেলনা। জানা গেল ডাক্তার সাহেব উনার চেম্বারে আছেন। হাসপাতালে উনার ডিউটি সকাল দশটায়। তার আগে উনি আসবেন না। যদি দ্রুত চিকিৎসা নিতে চান তাহলে তার চেম্বারে চলে যান। আবার আনা হলো ডাক্তারের চেম্বারে। অমলেশ ডাক্তার সাহেবকে বললেন, ডাক্তার সাহেব আমার ছেলেটার অবস্থা খুবই খারাপ। খুবই আর্জেণ্ট। ডাক্তার অমলেশের দিকে না তাকিয়েই বললেন, বাইরে অপেক্ষা করুন।এই রিপোর্টটি দেখে নিই তারপর আপনাদের ডাকা হবে। যান এখন বাইরে যান। অমলেশ বাইরে এসে বিমলকে বুকের মাঝে জাপটে ধরে রেখে বললো, বাপরে বাপ আমার। আরেকটু সোনা। এইতো ডাক্তার সাব এলেন বলে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বিমলের দেহটা নিথর হয়ে গেল। নিষ্পলক চোখের কোণা বেয়ে একফোটা জল গড়িয়ে পড়লো অভুক্ত ও অসহায় পিতা অমলেশের গালে। ডাক্তারের আশায় আর সবাই অপেক্ষা করতে পারলেও বিমল অপেক্ষায় থাকতে পারলোনা। অমল হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো। তখন ডাক্তার তাড়াতাড়ি এসে রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন, সরি হি ইজ ডেথ। কথাটা শুনে অমল ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, কি বললেন ডাক্তার সাব? এইনা কিছুক্ষন আগেও আমার বিমল এখানে ব্যথাতে কাতরাচ্ছিল। আপনাকে আমি গিয়ে বললাম। আপনি বললেন আপনার রিপোর্ট দেখানো রোগী আগে। আর এরই মাঝে আমার বিমল মারা গেছে?!!! তোরা ডাক্তার না তোরা কুত্তা। তোরা পাকিস্থানি হানাদার বাহিনীদের চেয়েও খারাপ। ওরা যেমন আমাদের দেশটাকে চুষে খেয়েছে। বাবা-ভাইদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। মা বোনের ইজ্জত লুটেছে। তোরাই বা তাদের থেকে কম কিসের? হা হা হা বলে পাগলের মতো হাসতে থাকে অমলেশ।

বিমলের লাশ বাড়ীতে আনার সাথে সাথে ভাস্বতী রাণী একবারই শুধু চিৎকার করে উঠলেন। আর কোন সাড়াসব্দ নেই। পার্শ্ববর্তী ডাক্তার এসে হাত ধরে ও বুকে ষ্টেথিস্কোপ লাগিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, হার্টফেইল। বাড়ী ভর্তি লোকজন। সবাই শুধু হায় হায় করতে লাগলো। এমনও কিছু ঘটে মানুষের জীবনে? অমলেশ নির্নিমেষ চেয়ে আছে। তার কোনদিকে যেন কোন খেয়াল নেই। তার বড় ছেলে নিখিলেশ গিয়েছিল তার বোন বিমলাকে আনতে। দূর থেকে সে তার বাবাকে ডাকতে ডাকতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো এবং বললো, বাবা সব্বনাশ হয়ে গেছে। নরম শান্ত গলায় অমলেশ বললো, সব্বনাশের আর কি বাঁকী আছেরে নিখিল? বাবা ওরা আমার বোনকে মেরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল। ঐ দ্যাখো ওর লাশ। এবার অমলেশ গগনবিদারী অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আর আকাশ পানে তাকিয়ে বলতে থাকে, হা ভগবান এবার তোমার আশ মিটেছে বুঝি? আমি অমল কি সারাজীবন পাপই করেছি তোমার দরবারে? কোনদিন কি এতটুকু পুন্য করিনি ভগবান? আমাকে আর কত কষ্ট দেবে বলো? আমার এ যন্ত্রণা এই কষ্টের কি শেষ নাই ভগবান? আমার এই দুঃখ কষ্টের শেষ কোথায় ভগবান, শেষ কোথায়? অমলেশের প্রশ্ন শুধু শান্ত বাড়ীর চারদিকে প্রতিধ্বণিত হতে লাগলো।

ভূত মানুষ

রাত্রি বারোটা বিশ। আনু আর অনিমেষ চলেছে অচেনা এক গ্রামে। যেখানে বাস করে অনিমেষের স্বল্প পরিচিত এক পরিবার। যাদের মেয়ে মারা গেছে প্রায় তিন মাস হলো। পুলিশ কোন হদিস দিতে পারেনি। এমনকি মেয়েটির মৃতদেহটিও পাওয়া যায়নি। বিশাল এক রহস্যময়তার গন্ধ প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে। গ্রামবাসির এক পক্ষের ধারণা মেয়েটির কারও সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে তার হাত ধরে চলে গেছে। আরেক পক্ষের কথা, মেয়েটি খুবই ভাল ছিল। যেমন মেধাবী তেমনি রূপবতী। গ্রামের সবাইকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। অনিমেষ ও আনু মোল্লাকে মেয়েটি সম্পর্কে বহুবার বলেছে। কিন্তু আনু মোল্লা মনোযোগ দেয়নি। অনিমেষ আনু মোল্লাকে কম করে হলেও কয়েক শত বার বলেছে এই কেসটির কথা। ও জানে আনু রহস্যের অনুসন্ধান করতে খুব ভালোবাসে। কিন্তু পুলিশ যেখানে ব্যর্থ! সেখানে কিনা আনু! অনিমেষ নাছোড়বান্দা। এক গুয়েও বটে। মাথার মধ্যে কিছু ঢুকলে তা আর বের হয়না। শেষ করে তবেই শান্তি। অগত্যা আসতেই হলো। রাস্তার দুধারে বেশ বড়ো বড়ো রেইন্ট্রি কড়ই গাছ। অনেকদূর অবধি লম্বা হয়ে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। আকাশে অষ্টাদশী'র চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে। কিন্তু সে আলো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে খুব অল্পই মাটি স্পর্শ করছে। আনু রাস্তার চারপাশ দেখছে আর হাঁটছে। শরীরটা কেমন শিরশির করছে। হাতের তালু পায়ের তালুতেও একই অবস্থা। কেউ স্যান্ডেল পায়ে বালুভর্তি ফ্লোরে হাঁটলে যেমন অনুভূত হয় তেমন। গা কেমন ছমছমে অবস্থা। আনু মোল্লা অনিমেষকে বলল, দিয়াশলাই দে সিগারেট জ্বালাবো। বলেই রাস্তার ধারে দাঁড়ালো। ঘনকুঞ্জ দেখে একধরনের নেশা লেগে গেল তার। প্রকৃতি দর্শনে ব্যাঘাত ঘটিয়ে অনিমেষ বললো, আনু এই নে। মাত্র চারটে সিগারেট আছে আর। এই রাত্রে এই গ্রামে কিন্তু কোথাও সিগারেট পাবিনা বলে রাখলাম। মনোযোগ সহকারে সিগারেটে আগুন লাগিয়ে মুখের ধোয়া মাথার উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে বললো, তুই না বললি এটা তোর স্বল্প পরিচিত কারও বাড়ী? তাহলে এখানে রাত্রে কোথাও দোকান পাওয়া যাবে কি যাবেনা তা জানলি কি করে, হুমমমম? আনুর প্রশ্নে হকচকিয়ে গিয়ে বলে, দেখ আনু ভাল হবেনা বলছি। আমার ব্যাপারে তুই কিচ্ছু আবল তাবল বলবিনা। জানিস আমি সবকিছু গুলায়ে ফেলি। তোর কথার মারপ্যাচ বুঝতে পারলে আজকের এই কেসের জন্য তোকে ডেকে আনতাম না। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে খানিক বিরতি দিলো। তারপর আবার শুরু করতে গেল। আনু মোল্লা অনিমেষকে ইশারায় থামতে বললো এবং কান খাঁড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করলো। শুকনো পাতার উপর দিয়ে মানুষ পা ফেলে হেঁটে গেলে যেমন শব্দ হয় তেমন শব্দ। পরিবেশটাকে ঠিক করতে অপ্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন করলো আনু, আচ্ছা অনি, এই গ্রামে দেখার মতো কি কি আছে? প্রশ্নটি করে অনিমিষের দিকে তাকিয়ে সিগারেটে জোরসে একটি টান দিলো। মুখের ধোয়া কুন্ডলী পাকিয়ে মাথার উপর চলে গেল। অনিমেষ বলতে শুরু করলো, এখানে আগে দেখার মতো যা ছিল এখন আর নাই। তবে নদী পাবি, খুব সহজ সরল মানুষ পাবি, সকল বৌ-ঝিদের গল্পের বাহার দেখতে পাবি।

- আগে যা দেখার মতো ছিল এখন আর নেই মানে?
- আরে বুঝলিনা গাধা? আমরা যেখানে যাচ্ছি উনার মেয়েটা ছিল দেখার মতো। একহাজারটা মেয়ে খুঁজলেও তুই পাবিনা।
- কিরে, কোন ভাবটাব ছিল নাকি তোর সাথে? প্রশ্নটি করেই আনু অনিমেষের দিকে প্রশ্নাতুর চোখে তাকালো।
- চলতো। বলেই অনিমেষ হনহন করে সামনের দিকে পা বাড়ালো।

আনু খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে অনিমেষের লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যেতে দেখলো। হঠাৎই একটি সাদা বিড়াল রাস্তা ক্রস করে চলে গেল এবং আনুর পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করলো। তারপর হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল। ডানপাশের বাড়ীর দেওয়ালে তখন বিশালাকৃতির কালো বিড়ালের অবয়ব। বামপাশে একটা প্রকাণ্ড একটা ভাঙ্গাবাড়ী। দেখেই গায়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল। প্রতিটি রোমকূপ থেকে যেন ঘাম বের হয়ে গড়িয়ে পড়ছে এমন শীতলতা রক্তে। ভাঙ্গাবাড়ীর ভেতর থেকে কেমন হাম হাম শব্দ বের হতে লাগলো। আনু ভূত প্রেতে বিশ্বাস করেনা। তবুও ক্ষনিকের মধ্যে তার শরীরটা খুব ভারি হয়ে উঠলো। নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। আনমনে হাতের সিগারেটে শেষটান দিতে গিয়ে ভড়কে গেল। কারণ সিগারেট আঙ্গুলের ফাঁকে নেই। পিছন ফিরে তাকাবে এমন সাহস করে উঠতে পারলোনা। তবুও নিজের মনের ধন্দ দূর করতে পূর্ণ সাহস সঞ্চয় করে দাঁড়ালো এবং পিছন ফিরে তাকালো। মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে একটা কালো এবং বিশাল বড় একটা বাদুর ছুঁটে এলো আনুর মুখ বরাবর। তাড়াতাড়ি করে মাথা নিচু করলো

ও। সাথে সাথে তিন চারটা হুতুম পেঁচা ট্যা ট্যা করে ডেকে উঠলো এবং তেড়ে এলো আনু মোল্লার দিকে। আনু পড়ি কি মরি করে দুপা পিছিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে ভাঙ্গাবাড়ীর এলাকা ছাড়লো। কিছুটা সামনে এগোতেই দেখলো অনিমেষ দাঁত বের করে বিশ্রী রকমের হাসি দিচ্ছে। সে হাসির মাঝে তাচ্ছিল্য মাখা তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তের হাসিটা আনু মোল্লার ভাল লাগলোনা। পিশাচের মতো লাগলো। ব্যাপারটিকে স্বাভাবিক করার জন্য আনু বললো, কিরে হাঁসছিস কেন? অনিমেষ কোন উত্তর না দিয়ে বললো, যেখানে যাচ্ছিস সেখানে চল। এতো প্যাচর প্যাচর করছিস ক্যান? কথাগুলো চুপচাপ শুনে গেল আনু। কোন জবাব দিলনা। অন্যসময় হলে ঠিকই উত্তর দিতো। এরপর যতটা পথ দুজন আগালো কেউ কারও সাথে কোন কথা বললোনা। বিশ মিনিট পর দুজন একটি বাড়ীতে পৌঁছালো। একটি মাত্র থাকার ঘর। রান্নাঘর বলতে যা, তা মূলঘরের বারান্দা বলা চলে। দুইটা রুম। অনিমেষ ডাকলো, কাকা বাড়ীতে আছেন নাকি গো? কাকা? অনেকক্ষন সাড়াশব্দহীন কেটে গেল। কেউ কোন জবাব দিলোনা। উত্তরের দিকে কলতলা দেখলো আনু এবং বললো, অনি তুই তোর কাকাকে ডাকতে থাক আমি একটু পানি খেয়ে আসি। বলেই কলতলায় গেল। কলের পাশাপাশি একটি কূয়াও আছে। বেশ লাগছে কূয়ার পানি। জোসনার আলোয় কূয়ার পানি ঝলমল করছে। কলে চাপ দিয়ে হাতভর্তি করে পানি খেল এবং হাত মুখ ধুয়ে নিল। এই প্রথমবারের মতো আবিস্কার করলো আনুর চুলগুলো ধূলোয় মাখামাখি অবস্থা। কলের পানি হাতে নিয়ে মাথা মাসেহ মতো করলো বেশ কয়েকবার। হঠাৎ কূয়ার উল্টোদিকের বাঁশের আড়া থেকে সুপারির খোলটি কিঞ্চিৎ দোল খেল। সেই সাথে একটি মেয়ের অবয়ব চোখের সামনে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সরে গেল। সেদিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো আসলে ঠিক দেখলো নাকি দৃষ্টিভ্রম। নাহ আর কিচ্ছু দেখা গেলনা। অনি'র পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়ালো আনু। অনি বললো, চল কাকা উঠেছে। চল, বলেই আনু মোল্লা আবার পিছন ফিরে কূয়ার উল্টো দিকে তাকালো কিন্তু কিছুই দেখতে পেলনা। মূল ঘরের পাশের রুমে থাকার ব্যবস্থা হলো ওদের। কিন্তু অনিমেষের এই কাকার দেখে মোটেও ভাল লাগলোনা। কেমন প্রানহীন রক্তশূন্য একটা মানুষ। ব্যবহারের মধ্যে প্রাকৃতিক কোন ব্যাপার নেই। মনে হচ্ছে সবই মেকি। নিজের উপর খুব রাগ হতে লাগলো আনুর। এমন রহস্য'র খোঁজে না এলেও পারতো ও। শোবার বন্দোবস্ত করলো অনি। তা দেখে আনু মোল্লা বললো, কিরে খেতে দেবেনা? অনি গা থেকে পাঞ্জাবী খুলতে খুলতে বললো, না। সারাজীবন তো কতই খেয়েছিস। আজকের রাত না হয় না খেয়েই থাকলি। মানে? প্রশ্ন করে অবাক বিস্ময়ে আনু তাকালো অনির দিকে। অনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো এবং মুহূর্তের মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করলো। আনু কোন কথা না বাড়িয়ে অনির পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো এবং সিগারেট বের করে দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করলো। দিয়াশলাইয়ের চমকিত আলোয় সেই মেয়েটির মুখায়ব সামনের উপর দেখতে পেল। সিগারেটে আগুন না জ্বালিয়ে মুখায়ব দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো আনু। দারুন ফর্সা এবং সুন্দর একটি মুখ। ঠিক যেন হাতে গড়া পুতুল। গায়ে ময়লামাখা একটি পুরুষের শার্ট আর একটি প্যাণ্ট। ভয় পাওয়ার পরিবর্তে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো মেয়েটিকে। যেন এর আগে কখনও কোন মেয়েকে দেখেনি আনু। দিয়াশলাইয়ের কাঠির আগুন যখন হাত স্পর্শ করলো তখন তাড়াহুড়ো করে জ্বলন্ত কাঠিটি ফেলে দিলো আনু এবং পুনরায় আরেকটি কাঠি জ্বাললো। এবার সিগারেটে আগুন লাগিয়ে মেয়েটির দিকে তাকালো এবং মনে মনে ভাবলো, আচ্ছা মেয়েটি কে? পাগল নাকি? ভাবনা মাঝে প্রবেশ করে মেয়েটি উত্তর দিলো, আমার নাম কল্পনা। ঠিকই ধরেছেন আমি এখন পাগলই বলা চলে। খুব অবাক হয়ে আনু মোল্লা ঠোঁটের সিগারেট আঙ্গুলের মধ্যে রাখলো এবং মনে মনে ভাবলো অনিকে ডাকা যাক। ঠিক তখনই মেয়েটি বলে উঠলো, ওকে ডাকার দরকার নেই। যা জিজ্ঞাসা করার আমাকেই করুন। এবার অপার বিষ্ময় আর উত্তেজনায় বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো আনু। হাতের সিগারেট খসে পড়লো মাটিতে। আনু খুব জোড়ে চিৎকার করলো কিন্তু সে চিৎকারের শব্দ আনু নিজেই শুনতে পেলনা। মেয়েটি কাছে এসে আনু মোল্লার ঠোঁটে তর্জনী আঙ্গুল রেখে ইশারায় বোঝালো চুপ কোন কথা নয়। আনু মনে মনে ভাবছে, আমি যে চিৎকার করতে চাচ্ছি মেয়েটি টের পেল কিভাবে? বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করে কল্পনা বলে উঠলো, আমি অনেক কিছুই টের পাই যা আপনারা টের পান না। এবার ভয়ে কুকড়ে যাওয়ার অবস্থা আনুর। তা টের পেয়ে কল্পনা বললো, আমি ভূত নই। আমি মানুষ। একথা শুনে আনু বললো, কে আপনি? আর আপনি আমার মনের কথা বুঝে যাচ্ছেন কিভাবে? আনুর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কল্পনা পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো, আপনি যাবেন আমার সাথে? প্রশ্নটি শেষ না করেই হাঁটতে শুরু করলো কল্পনা। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাকে অনুসরণ করে চললো আনু মোল্লা। কিছুদূর যাওয়ার পর ঘনকুঞ্জে নানা পাখ পাখালির ডানা

ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পেল আনু। একটা গাছের নিচে দাঁড়ালো দুজন। বকুল ফুলের গন্ধ লাগতে লাগলো নাকে। সবে ঝরে পরা ফুলের কাঁচা গন্ধ আর দুপুরের রোদে পুড়ে যাওয়া ফুলের গন্ধ মিশ্রিত হয়ে নাকের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলো। একদিকে প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য্য; অন্যদিকে অপার বিস্ময়। মাঝে দোদুল্যমান আনু মোল্লা। অনেক প্রশ্ন জমা হতে লাগলো আনু মোল্লার মনে। কিন্তু সবার আগে এমন সুন্দর পুতুলের মতো মেয়েটিকে মন ভরে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে আনুর। ইচ্ছে হচ্ছে হাতদুটো হাতের মধ্যে রাখতে খানিকক্ষন। তারপর সব কথা শোনা যাবে। আনুর ভাবনার মাঝেই কল্পনা এগিয়ে এলো আনুর দিকে। এক্কেবারে বুকের খুব কাছে এসে আনুর হাতদুটো উঁচু করে ধরলো এবং মুখ তুলে চাইলো আনুর দিকে। কল্পনার উচ্চতা ৫ ফিট ১ বা ২ ইঞ্চি হবে। মাঝারি গড়ন। চোখে দারুন মায়া এবং নেশা ভরা। অষ্টাদশীর চাঁদের আলো কল্পনার ঠিক মুখের উপর ঠিকরে পড়ছে বকুল গাছের পাতা ভেদ করে। সেই আলোয় মায়াবী চোখের চাহুনী আর পাতলা ওষ্ঠধর তিরতির করে কেঁপে উঠে বলে উঠলো, তুমি আমাকে মুক্তি দেবেতো আনু? প্রশ্নটি কর্ণকুহরে প্রবেশ করার সাথে সাথে কেপে উঠলো আনু এবং মুহূর্তের মধ্যে কল্পনার হাত ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে গিয়ে বললো, কে তুমি? কল্পনা আগের মতোই বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে হাত দুটি হাতে তুলে নিয়ে বললো, তুমিই তো কিছুক্ষন আগে চাইছিলে আমার হাতদুটি হাতের মধ্যে নিয়ে আমাকে মন ভরে দেখতে। তাহলে দূরে চলে এলে কেন? আনু গভীরভাবে তাকালো কল্পনার দিকে এবং বললো, তার আগে বলো কে তুমি? প্রশ্নটি শোনার সাথে সাথে কল্পনা আনুর হাত ছেড়ে দিতে দিতে বললো, বললামইতো আমি কল্পনা। বিস্তারিত জানতে চাও? তাহলে তা আজ রাত্রে সম্ভব না। কাল রাতে এসো। সব বলবো। তোমার বন্ধু তোমাকে খুঁজছে। আমার সাথে যে তোমার দেখা হয়েছে তা তাকে বলোনা। তুমি যার মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করতে এসেছো আমি সেই কল্পনা। কথাগুলো বলেই দ্রুতপায়ে স্থান ত্যাগ করলো কল্পনা। আনু মোল্লাও দ্রুত কল্পনাদের বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগলো। কিছুদুর এগোতেই অনির সাথে দেখা হয়ে গেল আনুর। আনুকে দেখে অনিমেষ বললো, কিরে তুই এখানে কেন? কয়টা বাজে খেয়াল আছে তোর? চারটা সাইত্রিশ। আনু মোল্লা কোন জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো, আচ্ছা যে মেয়েটা নিখোঁজ হয়েছে তার নাম যেন কি? অনিমেষ মুখ খিচিয়ে বললো, নিখোঁজ না বল খুন হয়েছে। নিখোঁজ হলে কি তোকে জানাতাম? ওর নাম কল্পনা। নামটি বলার সাথে সাথে মাথার উপর থেকে বৃষ্টির ফোটার মতো পানি ঝরতে লাগলো। তাড়াতাড়ি দুজন ঘরে ফিরলো। অনিমেষ কোন আর কোন কথা না বলে শুয়ে পড়লো। আনু সিগারেট নিলো এবং আগুন লাগালো সিগারেটে। দিয়াশলাইয়ের কাঠির আগুনে পুড়ে যাওয়া আঙ্গুলে ব্যথা অনুভব করলো এতক্ষনে। সিগারেটের একরাশ ধোয়া ছেড়ে দিয়ে কল্পনার কথা ভাবতে লাগলো। কি বলতে চায় মেয়েটি? ও যদি খুনই হয় তাহলে আমার সাথে দেখা করলো কে? প্রেতাত্মা? নাহ, প্রেতাত্মাতে বিশ্বাস করেনা আনু। জ্বীন আর ইনসান আছে। প্রেতাত্মা বলে কিছু নেই। তাহলে কল্পনা কে? ও কি আসলেই এই বাড়ীর মেয়েটা? নাকি অন্যকেউ আমাকে বোকা বানাতে চাইছে? নাকি এসব অনিমেষের কারসাজি? হাজারো প্রশ্ন দলা পাকিয়ে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। অভুক্ত রাত আর সিগারেটের ধোয়া পেটের মধ্যে অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরী করে ফেলেছে। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে পাশে রাখা পানির জগটা টেনে নেয়। কাঁসার জগ বেশ লম্বা গলা। মুখ না লাগিয়ে অনেকটা পানি গলার মধ্যে ঢেলে নেয় আনু। পানি খাওয়া শেষ হলে বিছানা সটান শুয়ে পড়ে সে। মূহুর্তের মধ্যেই ঘুমিয়ে যায়।

সকালে আনুর ঘুম ভাঙলো অনিমেষের গালগল্পের শব্দে। এমন সব হাত বানানো কথা বলতে পারে ও। যে কেউ শুনলে ওর গল্প সত্যি বলে মানতে বাধ্য। অনি গল্প করছে কল্পনার বাবার সাথে। আর সব কৌশলী বাবাদের মতো চেহারা না তাঁর। অনেক সহজ সরল বাবা। মুখের দিকে তাকাতেই কেমন নত নত ভাব মনের মাঝে কাজ করতে লাগলো। দুজন গল্প করছে উঠানে বসে। লুচি ভাজির গন্ধ নাকে লাগছে আনুর। সেই সাথে আলুর দমের কড়া মশলার গন্ধ। সারারাতের অভুক্তির ফলে জিভে জল এসে গেল। তবুও নিজেকে সংবরণ করে চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে তোয়ালেটা গায়ে ফেলে বাইরে এসে কল্পনার বাবাকে নমস্কার জানালো এবং পা ছুঁয়ে সালাম করলো আনু। তা দেখে কল্পনার মা দূর থেকেই বললো, কইরে তনু তোর দাদাকে একটা টুল দে। ষোল সতের বছর বয়সের একটি মেয়ে টুল এগিয়ে দিল। তার দিকে তাকিয়ে ভীষণভাবে চমকে উঠলো আনু। কারণ গতরাতে এই মেয়েটিই তো তার সাথে দেখা করেছে। অবাক হয়ে তার দিকে খানিকক্ষন তাকিয়ে রইলো আনু। মেয়েটি আড়চোখে তা লক্ষ্য করে স্থানত্যাগ করলো। তিনজন মিলে কল্পনার নিয়ে বিভিন্ন কথা বলাবলি করতে লাগলো। আনু মাঝে মাঝেই তনুর দিকে তাকাচ্ছিল এবং তনুর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছিল। বারবার তনুর দিকে তাকানোর ফলে চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছিল। লজ্জায় মুখনত করে তনু

তার মায়ের কাজে সাহায্য করতে লাগলো। আনুও কল্পনার আলোচনায় পূর্ণ মনোযোগ দিলো। সবিশেষ সারাংশ দাঁড়ালো এই, কল্পনার কোন ছেলের সাথে কোনপ্রকার কোন সম্পর্ক ছিলোনা। অনিমেষ এই বাড়ীতে প্রায়ই আসতো। অনিমেষের ভাষ্যমতো কল্পনাকে খুব ভালোবাসতো। কল্পনার বাবার ইচ্ছা ছিল ভাল দিনক্ষন দেখে অনি'র সাথে কল্পনাকে বিয়ে দেবে। যেহেতু কল্পনা খুন হয়েছে (অনিমেষের ভাষ্যমতে কিন্তু কল্পনার বাবা একবারও বলেন নি কল্পনা খুন হয়েছে বা হতে পারে।) তাই কল্পনার ব্যাপারটির সুরাহা হলে ভাল দিনক্ষন দেখে তনুর সাথে অনিমেষের বিয়ে দেবে। সমস্ত ঘটনার বিবরন এবং কল্পনার সাথে সাক্ষাত ব্যাপারটি খুবই জটিল আকার ধারণ করলো। টুল থেকে উঠে ঘরে প্রবেশ করলো এবং সিগারেট জ্বালালো। হঠাৎই ঘরে তনু প্রবেশ করে বললো, একি আপনি বাসি মুখে সিগারেট জ্বালালেন যে? প্রশ্নটি করে আনুর মুখের দিকে তাকালো তনু। সেই একই চাহুনী একই ঠোঁটের তিরতিরানি। মূহুর্তের মধ্যে যেন সারা পৃথিবী সুনসান নীরবতায় ভরে গেল। কোন কথা বের হলোনা আনুর মুখ থেকে। গলায় খাকারি দিয়ে তনু বললো, কি হলো আপনার? কিছু বললেন না যে? দ্বিতীয়বারের মতো প্রশ্ন করার পর সম্বিত ফিরে পেয়ে আনু বললো, আচ্ছা তুমি মানুষের মনের ভাবনা বুঝতে পারো? প্রশ্নটি শুনে ভুবন ভোলানো মুচকি হাসি দিয়ে তনু বললো, আমি পারিনা তবে দিদি পারতো। চলুন নাস্তা করবেন, বলেই তনু ঘরের বাইরে চলে এলো। আনু তনুকে অনুসরন করতে করতে ঘর থেকে বের হলো। নাস্তা করার জন্য বারান্দায় পাটি বিছিয়ে বসেছে কল্পনার বাবা আর অনিমেষ। হঠাৎই আনুর মনে হলো ব্রাশ করা হয়নি। তাই তনুকে উদ্দেশ্য করে বললো, দাঁত মাজা পাউডার হবে? তনু প্রায় দৌড়ে স্থান ত্যাগ করলো এবং ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে পাউডারের ছোট্ট একটি কৌটা এনে আনুর কাছে দিল। আনু মোল্লা বামহাতের তালুতে কিছুটা পাউডার ঢেলে নিয়ে কৌটাটি তনুর হাতে দেওয়ার উসিলায় ছুঁয়ে দিলো এবং মধ্যমা আঙ্গুলে অল্প থুথু লাগিয়ে পাউডার জড়িয়ে মুখের মধ্যে দিয়ে ডান থেকে বাম আর বাম থেকে ডানে ঘসতে লাগলো। ভাবনার মাঝে উপস্থিত হলো কল্পনা আর তনু। রাত্রে যাকে দেখেছিল আর সকাল থেকে যাকে দেখছে দুজনই দেখতে প্রায় একই রকম। তবে স্পর্শ ভিন্ন। দুজনের রক্তের ধারা দুরকমের। কল্পনার রক্তের ধারা শীতল আর তনুরটা গরম। তাহলে কি কল্পনা প্রকৃতপক্ষেই আমার কাছে কল্পনা? প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়না আনু। মাথার মধ্যে অস্বস্তি এসে ভর করে। কারণ সেই মাঝরাত অবধি অপেক্ষা করতে হবে কল্পনার দেখা পেতে হলে। আজ দেখা হলে সব বলবে বলেছে। দাঁত মাজা শেষ হলে আনু তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নেয় বাইরে যাবে বলে। কারণ সিগারেট শেষ। তা দেখে অনিমেষ বলে, কিরে পোশাক পরলি যে? শার্টের হাতা গোটাতে গোটাতে আনু বললো, সিগারেট শেষ আমার মাথা আর কাজ করছেনা। বলেই অনিমেষের দিকে তাকালো। চালাকি আর উপহাসের হাসি দেখা গেল অনিমেষের দুচোখের কোনে। সেই সাথে সাথে তার অপরাধবোধও চোখের সামনে ভেসে উঠলো দৃশ্যমান হয়ে। তা দেখে আনু খুবই অবাক হলো। অনিমেষ ওর খুব ছোট্টবেলার বন্ধু। কতদিন দুজন একসাথে থেকেছে, খেয়েছে, ঘুমিয়েছে। কিন্তু আজকের মতো এমন বিদঘুটে রূপে আর কোনদিনও দেখেনি। নানা ভুল হলো আনুর। কারণ গতরাতেই তাকে পিশাচরুপে দেখেছে। এমন ভাবনাতে যখন মত্ত আনু ঠিক তখনই অনিমেষ সিগারেটের প্যাকেট আনুর দিকে বাড়িয়ে ধরলো এবং বললো, এই নে তোর সুন্দর সকাল। বলেই প্যাকেটটা আনুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঘরের বাইরে এলো। আনু মোল্লা বিছানায় বালিশে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট জ্বালালো। খুব দ্রুত সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে সিগারেটের অর্ধেকটা জানালা দিয়ে ফেলে দিলো এবং চোখ বন্ধ করে কল্পনার অবয়ব মনের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। যতবারই চেষ্টা করলো প্রতিবারই তনুর মুখ মনে আসে। অথচ দুজনের রক্তের ধারা এক না। একজন ঠাণ্ডা আরেকজন গরম। এটুকু ভাবতেই দুচোখের পাতায় ঘুম নেমে এলো আনু মোল্লার।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলনা আনু। রাত এগারোটা! এতোটাক্ষন এর আগে আর কোনদিন ঘুমায়নি সে। কিভাবে এতোটাক্ষন আনু ঘুমালো? প্রশ্নের জবাব নেই ওর কাছে। সারাটা শরীর ব্যথা। যেন কতশত পরিশ্রম করে ঘুমাতে গেছে ও। দিনের বেলা এতোটাক্ষন ঘুমানোর ফলে ঘুমক্লান্তি আনুর চোখে মুখে। বাব্বাহ মানুষ বুঝি এমন করে ঘুমায়? ভ্রু নাচিয়ে প্রশ্ন করলো তনু। বিছানা থেকে উঠতে উঠতে আনু বললো, আমার জীবনে আজই প্রথম এতোটাক্ষন আমি দিনের বেলা ঘুমালাম। কথাটা শুনে ঝংকার দিয়ে তনু বললো, থাক আপনাকে আর নিজের সাফাই গাইতে হবেনা। বাবারে বাবা, মানুষ এমন করে ঘুমাতে পারে? অনি এসে তিনবার ডাকলো। বাবা ডাকলো। আমি এসে গায়ে হাত দিয়ে কতবার ডাকলাম। বলি কিছু খেয়েছেন টেয়েছেন নাকি হুমমম? কিছু খেয়েছেন টেয়েছেন নাকি কথাটা কানে যেতেই আনু বেশ লজ্জার মুখে পড়ে

গেল। ভাগ্যিস কল্পনার মা-বাবা এখানে কেউ নেই। কি ভাবতো তারা। যেহেতু আনু মোল্লা সিগারেট ছাড়া আর কোন বদঅভ্যাস নেই তাই দরাজ গলায় বললো, আমি খাওয়ার মধ্যে শুধু সিগারেটই খাই। তাছাড়া আর কিছু খাইনে। 'ঠিক আছে ঠিক আছে, আর কিছু খেতে হবেনা। আপাতত ভাত খেয়ে নিন। বাবা আর অনি গেছে কীর্তন শুনতে। ফিরতে ফিরতে ভোর রাত। আপনাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। যেহেতু আপনি গভীর ঘুমে মগ্ন ছিলেন তাই আপনি ছাড় পেয়েছেন। মুসলমান হয়েছেন তো কি হয়েছে। বাবার কথা একটাই কীর্তন যে কোন ধর্মের যে কেউ শুনতে পারে। চলুন খাবেন চলুন।

রাতের খাবার যখন শেষ করে উঠলো রাত্রি তখন ১১টা ৫৭। শোবার ঘরটাতে এসে বিছানায় হেলান দিয়ে হারিকেনের নিভু নিভু আলোয় বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল আনু। দরজা খোলা। হঠাৎ দরজা দিয়ে ঘরে কেউ একজন প্রবেশ করলো। কিন্তু মুখটা হারিকেনের আলোয় বোঝা গেলনা। যখন খুব কাছে এসে কোলের কাছে বসলো তখন আনু বুঝতে পারলো এ তনু নয় কল্পনা। আনু কোন কথা বললনা। ধীরে ধীরে সিগারেটটা শেষ করলো। ততক্ষন কল্পনা আনুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টিতে। আনু কান খাড়া করে তনুর অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা করলো জেগে আছে নাকি ঘুমিয়ে। কল্পনা ফিসফিস করে বলে উঠলো, মা জেগে আছে কিন্তু তনু ঘুমিয়ে গেছে। ও মূহুর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে যেতে পারে। চলো। বলেই সিগারেটের প্যাকেট আর দিয়াশলাই হাতে করে কল্পনা যাওয়ার জন্য উদ্যত হলো। আনু বললো, সিগারেট নিচ্ছো কেন? কল্পনা বললো, তোমার লাগবে তাই। ওহ। আলতোস্বরে কথাটি বলে কল্পনার পথকে অনুসরণ করতে লাগলো। ধীরে ধীরে দুজন হাঁটতে লাগলো। ঘনকুঞ্জ ছেড়ে দুজন হাঁটছে আর হাঁটছে। অথচ কেউ কোন কথা বলেনি। হঠাৎই কল্পনা বলে উঠলো, তোমার নাম আনু মোল্লা। তুমি খুব ভাল একটা মানুষ। রহস্য উদঘাটন তোমার শখ। কিন্তু অনমেষ তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে অপদস্ত করতে। কারণ ও তোমাকে খুব হিংসে করে। আর তুমি খুব সরল সহজ এবং একরোখা। যাইহোক, আসল কথায় আসি। অনিমেষ আমাকে ভালোবাসার অভিনয় করতো। আমি ওকে কোনদিনও ভালোবাসতে পারিনি। ওর স্বভাব চরিত্র আমার কাছে কোনদিনও ভাল লাগেনি। ও নিজে থেকেই আমার জন্য অনেক কিছু করতে চাইতো। বাবা-মা ওর প্রতি খুব দূর্বল ছিল এখনও আছে। কারণ আমার বাবার উপার্জন খুবই সীমিত। আমার পড়ালেখার ভার বাবা বহন করতে পারবেনা বলেই আমাকে কলেজে ভর্তি করতে চায়নি। আমি নিজে টিউশনি করে আমার পড়ালেখা চালাচ্ছিলাম। হঠাৎই একদিন আমাদের মেহমান হিসেবে অনিমেষকে পেলাম। দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই। প্রথম দেখাতেই সে আমাকে প্রেম নিবেদন করে বসলো। আমি হা না কিছুই বললাম না। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে আসতে শুরু করলো। এমনকি সপ্তাহে তিনদিনও এসেছে। আমার কলেজে যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলার জন্য। এমনতর সব পাগলামী দেখে ওর প্রতি আমি কিছুটা দূর্বল হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওকে হ্যাঁ বলে দিবো। কিন্তু যেদিন হ্যাঁ বলে দিবো বলে ভাবলাম সেদিনই খেয়াল করলাম আমাদের গ্রামের বেশ কিছু বদছেলেদের সাথে তার ভাব। তাই আমার সিদ্ধান্ত আমি পরিবর্তন করলাম। কারণ চরিত্রহীন লোকদের সাথে কেবল চরিত্রহীনদের সুসম্পর্কই থাকতে পারে। আনু কিছু একটা বলে যাচ্ছিল কল্পনা তাকে বাধা দিয়ে বললো, তুমি যা বলতে চাইছো তা আমি জানি। তুমিওতো চরিত্রহীনদের সাথে চলো এইতো? আনু, সবাই তোমার মতো না। আনুকে অবাক করে দিয়ে আবারও কল্পনা আনুর মনের কথা বলে দিলো। কল্পনা আবার বলতে শুরু করলো, আমি মনে প্রাণে চাইছিলাম বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু আমি একটা একলা মেয়ে কোথায় যাবো, কি করবো? ভেবে ভেবে কোন কূল পেলাম না। এমন সময় লক্ষ্য করলাম অনিমেষ আমাদের বাড়ীতে আসা বন্ধ করলো। কিন্তু পথে ঘাটে বাবার সাথে দেখা সাক্ষাত অব্যাহত রাখলো। আর বাবাকে সাংসারিক খরচের টাকা দিতে থাকলো। হঠাৎ এক অমাবশ্যার রাতে মা-বাবা পিসিদের বাড়ীতে বেড়াতে গেছে। আমি আর তনু আছি ঘরে। রাত্রি বারোটা কি সাড়ে বারোটা। আমাদের উঠানের উপর কয়েকজনের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি ঘরের মধ্যে থেকেই উচ্চস্বরে বললাম, কে বাইরে? উঠান থেকে অনিমেষ বললো, কল্প আমি অনি। আমি দরজা খুলে বাইরে এলাম দেখলাম অনি একা দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখে আমি বললাম, বাবা-মা তো বাড়ীতে নেই। তা শুনে অনি বললো, আমিই তো পিসিদের বাড়ীতে যেতে বলে খবর দিয়েছি। কথাটা বলেই অনি আমার মুখ চেপে ধরে। আমি অস্পষ্টস্বরে তনুকে ডাকি। কিন্তু ও ঘুমালে মরা। ও কিচ্ছু টের পেলনা। ওরা পাঁচজন মিলে আমাকে আড়কোলা করে নিয়ে গেল ঘনকুঞ্জের দিকে। ভাঙ্গাবাড়ীর পাশে ঝোপের মধ্যে ওরা আমাকে একে একে শকুনের মতো খুবলে খুবলে খেল। আমার বুকফাটার চিৎকার কেউ শুনতে পেলনা আমার শরীরের ওরনার কারণে। ওরনার প্রায় পুরোটা তখন আমার গালের মধ্যে পুরে দেওয়া। আমি

আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলাম যেন জ্ঞান না হারাই। কিন্তু আমি জ্ঞান হারালাম। যখন আমি কিছুটা সম্বিত ফিরে পেলাম তখন দেখলাম ওরা আমাকে আড়কোলা করে নিয়ে যাচ্ছে নদীর দিকে। আমি দম বন্ধ করে রইলাম। খুব অল্প অল্প নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম যাতে ওরা মনে করে আমি মরে গেছি। ওদের কথোপকথন শুনে নিশ্চিত হলাম ওরা ধরেই নিয়েছে আমি মরে গেছি। নদীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে ওরা আমার ওড়না আমার গলায় প্যাচ লাগিয়ে মৃত্যু যখন নিশ্চিত করতে চাইলো; তখন আমার বেঁচে থাকার সব দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। আমি যদি চাইতাম যে চিৎকার করি, তাহলে আমি বাঁচতেই পারতাম না। তাই চুপ রইলাম। ওরা যখন ওরনাটা আমার গলায় প্যাচ লাগিয়ে দুদিক থেকে টান দেবে এমন সময় কয়েকটি লোক নৌকা করে ঘাটে আসে। ওরা ভয়ে আমাকে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে চলে যায়। আমি যখন নদীর জলে আচড়ে পড়লাম তখন নৌকার লোকগুলো ভাবলো পাড় ভেঙ্গে বুঝি নদীতে পড়লো। আমি ও কোন প্রকার কোন শব্দ না করে সাঁতড়ে কুলে এলাম। তারপর বহুকষ্টে এখন যেখানে, এখানে এসে পৌঁছলাম তখন ফজরের আজান দিলো। আনু মোল্লা লক্ষ্য করলো কথার মাঝখানে ওরা সেই ভাঙ্গাবাড়ীর মধ্যে পৌঁছে গেছে। চর্তুদিকে লতাপাতায় ছাওয়া। একটা জায়গা একটু বসবাসের মতো করে কল্পনার ছোট্ট সংসার পাতা। সেই রাত্রের সেই প্যাণ্ট আর শার্ট দড়িতে ঝোলানো। ময়লা চটের বস্তার উপর বসলো কল্পনা। সিগারেটের প্যাকেট আনু মোল্লার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও সিগারেট জ্বালাও। অবাক চোখে কল্পনার দিকে তাকিয়ে আনু মোল্লা বললো, তোমার সব কথাই শুনলাম। তুমি শুধু আমাকে বলোতো তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পারো কিভাবে? কল্পনা সিগারেটের প্যাকেট আনুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, আমি জানিনা কিভাবে জানি। তবে এটুকু বলতে পারি, আমি কোন মানুষকে গভীরভাবে ভাবলে তার মনের কথা আমার কানের কাছে এসে বাজে। মনে হয় যেন সে মনে মনে যে কথাগুলো বলছে তা সে মনে মনে বলছেনা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলছে। সিগারেট জ্বালাও। আনু সিগারেট জ্বালালো এবং কল্পনার বরাবর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো, তিনমাস কতরকম চেষ্টা তদবির চলছে। সবাই খুঁজেছে। এখানে গ্রামের কেউ বা পুলিশ তোমাকে খুঁজতে আসেনি? কল্পনা আনুর খুব কাছে এসে আনুর মাথার চুলগুলো নাড়তে নাড়তে বললো, হুম এসেছিল। আমি ততক্ষনে ঘনকুঞ্জের বহু উচু গাছের ডালে। যেখানে দিনের আলোয়ও কারও চোখ পৌঁছবে না। তারপর এখানে যেহেতু ওরা আমাকে নিঃশেষ করেছিল তাই আমাকে দেখার পর ওরা ভেবেছিল আমি ভূত হয়ে ফিরে এসেছি। সারা গ্রামে ওরাই রটিয়ে দিলো ভাঙ্গাবাড়িতে ভূত থাকে। দিনের বেলায় যদি আমি রান্নাও করি সে রান্নার ধূয়া দেখে সারাগ্রামের লোক ভাবে ভূতে রান্না করছে। পুলিশও যেদিন গ্রামবাসির মুখে শুনলো এখানে ভূতে রান্না করে; তারাও এখানে খুঁজতে আসা বাদ দিল। গ্রামবাসির কাছে পুলিশ বললো, মেয়েটার স্বভাব চরিত্র ভাল ছিলনা। কারও সাথে ভেগে গেছে। যদি অন্য কোন ব্যাপার ঘটতো তাহলে কিছু আলামত পাওয়া যেত। অতঃপর অনিমেষ তার কাম-বাসনা আমাদের গ্রামের যুবতী মেয়েদের দিয়ে দিনের পর দিন করতে থাকে। এমনকি পুলিশ প্রশাসনও অনিমেষের পক্ষে। কারণ অনিমেষের বহু টাকা আছে। "কিন্তু অনিমেষই তো আমাকে বলেছে তোমার খুনের ব্যাপারে তদন্ত করতে। ও জড়িত তা আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা। হঠাৎ অবিশ্বাসের সুরে কথা বলে ওঠে আনু। তখন কল্পনা বলে, আনু অনিমেষ তোমাকে এখানে এনেছে ওর বন্ধুদের দিয়ে তোমাকে মারার জন্য। তোমার প্রতি ওর অনেক ক্ষোভ আছে। কারণ তোমার কারণেই ও গ্রামে নিগৃহিত। ওদের সমাজ ওকে দেখতে পারেনা। ও তোমার কারণেই গ্রামের মেয়েদের সাথে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে পারেনা। এখানকার বন্ধুদের সাথে তাই শলাপরামর্শ করে তোমাকে এখানে এনেছে আমার খুনের তদন্ত করতে। যাতে তুমি ব্যর্থ হও আর সেই দোষে তোমাকে শাস্তি স্বরূপ মানহানি করবে এমনকি তোমার গায়ে হাত তুলবে। যা ওরা বলাবলি করেছি ঘনকুঞ্জের সেই বড়গাছটির তলে যেখানে আমি দিনের বেলায় আশ্রয় নিই। বিবরণ সমস্ত জানার পর আনু মোল্লা একের পর এক সিগারেট জ্বালাতে থাকে এবং ভাবতে থাকে। ফজরের আজানের পূর্ব মূহুর্তে আনু মোল্লা কল্পনাকে বুকের মাঝে নিয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললো, তোমার উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তা আমি কেন পৃথিবীর কেউই তার ক্ষতিপূরণ দিতে পারবেনা। তবে তুমি যেহেতু আমাকে তোমার আপন ভেবে তোমার সব আমাকে জানিয়েছো। আমি আপ্রান চেষ্টা করবো তোমার পৃথিবীতে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করে দোষীদের আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ততদিন অবধি তুমি কি করবে? একথা শুনে আনুর বুক থেকে মাথা তুলে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলে, তুমি যদি আমার পৃথিবী আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারো তাহলে আজীবন আমার মনমন্দিরে আনু নামের দেবতাকে ফুলে ফুলে সাজিয়ে রাখবো আর ভগবানের কাছে তোমার মঙ্গলকামনায় প্রদীপ জ্বালবো। আর যদি তুমি আমার পৃথিবী আমাকে ফিরিয়ে দিতে না পারো; তাহলে কল্পনা যেমন

পৃথিবীর মানুষের কাছে বেঁচে থেকেও ভূত সেজে আছে। সত্যি সত্যিই কল্পনা মরে গিয়ে ভূত সেজে পৃথিবীর মানুষের কাছে ফিরে আসবে তাদের শাস্তি দিতে।

আনু আর কোন কথা না বলে কল্পনাদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। দূর মসজিদ হতে আজানের সুললিত ধ্বনি বাতাসে ভেসে ভেসে আসে। কল্পনাদের বাড়ী প্রবেশ করার মুখেই অনিমেষের সাথে দেখা হয়ে যায় আনুর। অনি প্রশ্ন করে, কিরে কোথায় গিয়েছিলি? আনু অল্প কথায় জবাব দেয়, পরে বলবো। কলতলায় গিয়ে হাতমুখে পানি দেয়। তারপর বিছানায় এসে সটান হয়ে শুয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙ্গে যখন, তখন ঘড়িতে সময় দুপুর ১২ টা ৩৯। তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়ে আনু। তনুর কাছে অনির খবর জানতে চায় ও। তনু জানায় অনি গ্রামের কিছু ছেলেপুলের সাথে উত্তরপাড়া গেছে। ফিরবে রাতে। নাও ফিরতে পারে। আনুও এটাই চেয়েছিল যেন অনি না থাকে। সুযোগ বুঝে বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়লো। ঘনকুঞ্জের কাছে এসে ধীর পায়ে হাঁটতে থাকে আনু। কারণ শুকনো পাতার শব্দ কানে প্রবেশ করছে ওর। পুরনো ভাঙ্গাবাড়ীর ভিতর দিক থেকে কল্পনা আনুকে অনুসরন করছে। তাই আনু ধীরে ধীরে হাঁটছে। ভাঙ্গাবাড়ীর ভাঙ্গা দেওয়ালের কাছে দাঁড়ালো এবং চতুর্দিকে একপলক দেখে নিয়ে বললো, কল্পনা আনুর জন্য দোওয়া রেখো। যেন ও ওর কাজে সফল হতে পারে। কল্পনা ছোট্ট করে বলে, ইনশাআল্লাহ। কল্পনার মুখে ইনশাআল্লাহ শব্দটি শুনে আবেগে অভিভূত হয়ে আনু মোল্লা দ্রুত পা চালায় স্থানীয় পুলিশ ষ্টেশনে। ওসি সাহেবের সাথে বিস্তারিত কথা হয়। যাদের উপর তদন্ত দায়িত্ব দেওয়া ছিল তাদের ডাকা হয়। বিস্তারিত জানার পর ওসি সাহেব মামলার তদন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন এবং আজ রাতেই আসামীদের গ্রেফতার করবেন বলে জানান।

রাত্রি বারোটা বিশ। ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের আবছা আলোয় কল্পনার মুখটি দেখতে পাচ্ছে আনু। হাতে ক্ষয়ে যাওয়া সিগারেট। আঙ্গুল ছুঁই ছুঁই করছে সিগারেটের আগুন। উঠানে বসে একের পর এক সিগারেট টানছে ও। অনিমেষ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছে। ঘড়িতে রাত্রি একটার সংকেত দিলো। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী উপস্থিত কল্পনাদের বাড়ীর উঠানে। অন্যান্য আসামীদের হাতে হাতকড়া পরানো। দুজন পুলিশ অনিমেষের ঘুমানোর কক্ষে প্রবেশ করলো এবং ঘুম থেকে টেনে তুলে হাতে হাতকড়া পরালো এবং ঘর থেকে টেনে বের করলো। আনুমোল্লা তখনও সিগারেট টেনেই যাচ্ছে। ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে। অনিমেষকে আনুর সামনে দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তা দেখে আনু মোল্লা পুলিশকে থামতে বললো এবং অনিমেষের উদ্দেশ্যে বললো, সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলি না কোথায় গিয়েছিলাম? গিয়েছিলাম তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। এই কথা শোনার পর পিশাচের মতো দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললো, বুঝলাম তুই জিনিয়াস। তোকে দিয়ে হবে। তবে ভাবতে হবে কতদিনে হবে? গ্রেফতার করাতে পারিয়েছিস। প্রমাণ করতে পারবিতো? এই কথাটা শোনার সাথে সাথে আনু মোল্লা পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে বললো, সময়ই তা বলে দেবে। তবে তোর জন্য একটা ভাল খবর আছে। অনিমেষ ছোট্ট করে প্রশ্ন করলো, কি? আনু মোল্লা মুখভর্তি সিগারেটের ধোয়া মাথার উপর ছড়িয়ে দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে বললো, কল্পনা বেঁচে আছে। হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠে অনিমেষ প্রশ্ন করলো, মানে???!!! আনু মোল্লা বললো, হুম কল্পনারা বেঁচে থাকে। আর তোদের মতো নরপিশাচ আর সমাজের কীটরা যুগে যুগে কালে কালে হয় পদদলিত আর পদলুণ্ঠিত।

পকেটমার

গুলিস্থান একটি চায়ের দোকানে চা পান করছিলাম। হঠাৎ একটা লোক এলো। চোখে মুখে ক্ষুধার ছাপ স্পষ্ট। গায়ে ময়লা টিশার্ট আর অনেক দিন ধরে না ধোয়া জিন্সের প্যাণ্ট। সারা গায়ে মুখে ধূলোর আস্তরন। বোধহয় আজ গোসল হয়নি। অথবা খুব সকালে গোসল করেছে সারাদিন বাইরে বাইরে থাকার কারনে এমন দেখাচ্ছে। চুলগুলো উসকো খুশকো। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অকারণে মুখ নাড়ছে। কিছু খেলে যেমন করে মুখ নড়ে। মুখ নাড়ার কারণে গোফগুলো গালের মধ্যে চলে যাচ্ছে। কিন্তু চোখে মুখে অদ্ভুত চাহনী। পায়ে সস্তা বার্মিজের স্যান্ডেল। প্যাণ্টটা নিচের দিক থেকে ফোল্ডিং করা। যেহেতু সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে, তাই নিচের দিক থেকে খানিকটা ভেজা। হাতে সস্তা দামের ঘড়ি। কিন্তু ঘড়িটা সঠিক সময় দিয়ে যাচ্ছে। দামে সস্তা হলেও কাজটি সঠিক ভাবে করে যাচ্ছে। আমি আমার ঘড়ির সময়টা দেখলাম ছয়টা সাইত্রিশ। লোকটার ঘড়িতেও তাই। বামহাতে ঘড়ি পরা। সেই হাতটিই টিশার্ট তুলে ধরে পকেটে ঢুকালো। অনেকক্ষন প্রচেষ্টার পর একটাকার একটা কয়েন বের করে আনলো। ঠিক একই ভঙ্গিতে ডানহাত ঢুকালো ডান পকেটে। কিন্তু সে হাতটি শুন্য বের হয়ে এলো। চোখ দুটো স্থীর আর নানা চিন্তায় কপাল কুচকে যাওয়ার মতো করে কুচকে গেল। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে পিছনের দিকের ডান পকেটে হাত ঢুকালো এবং মুহূর্তে চোখের পলক পড়লো। কুচকানো কপাল মুহূর্তের মধ্যে পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলো। হাতে মোট এগারো টাকা। তারপরও কি যেন মনে করে বামপকেট, ডানপকেট, পিছনের ডান পকেটে হাত দিলো। এমনি করে বেশ কয়েকবার খুঁজলো। যেন আরও কিছু টাকা থাকার কথা। প্রতিবারই তার হাত শুন্য অবস্থায় ফিরে এলো। এবং প্রতিবারই তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, সে কখনো একটিবারের তরেও পিছনের বামপকেটে তার হাত ঢুকালো না। চায়ের দোকানদারের দিকে এগারো টাকা বাড়িয়ে দিলো এবং বললো, দুধচা আর ষ্টার দাও। দোকানী চা দিতে দিতে বললো, আর একটাকা। উত্তরে বললো, আরেক টাকা নাই। চা একটু ছোট করে দাও। দোকানী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, মানে? মানে আর এক টাকা নাই। তাই চা একটু কম দিতে বললাম। কথাটা বলতে বলতে বেঞ্চে বসলো। দোকানী আর কোন কথা না বাড়িয়ে চায়ের কাপ লোকটার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। চায়ের কাপ নিতে নিতে বললো, ভাই আখেরাতের জন্য আবার বাধায়ে রাইখেন না। যা হিসেব করার এখনই করে নেন। এমনিতেই ম্যালা হিসেব দিতে হবে। কত মানুষের আর হিসেব দেবো কনতো? কথাটুকু শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে উদ্যত হলো। ঠোঁটদুটো শুকনো। মনে হচ্ছে পেটের মধ্যেও শুকনো। একটু পানি হলে সেই শুস্কতা দূর হতো। কিন্তু পানি খেতে গেলে আরও এক টাকা খরচ হয়ে যাবে। তাই ভেবেই বোধহয় চায়ের কাপটাতে চুমুক দেওয়া থেকে বিরত হলো। কাপটা একটু দূরে রেখে ঠোঁটদুটো একটিবারের তরে জিহবা দিয়ে ভিজিয়ে নিল। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললো, আল্লাহ তায়ালা কার রিজিক যে কোথায় রেখেছেন ভাইজান তা একমাত্র তিঁনিই জানেন। কথাটা বলেই আশে পাশে দু একজনকে বোধহয় খুঁজলো যে এতো মানুষের ভীড়ে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা। আমার দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। তার দুটি চোখে আমি আনন্দের ঝলকানি দেখতে পেলাম। কারণ তার প্রত্যাশা অনুযায়ী আমাকে পেয়ে গেছে। তার বিজয়ের আনন্দে সে অত্যন্ত পুলকিত। অতএব আমার সাথেই কথা জুড়ে দিলেন, ছোট্টবেলায় লেখাপড়া শিখতে গিছলাম। সংসারের বড়ছেলে তাই ছোটগুলোর দায়িত্ব আমার উপরই আসে। বাপ আমার উড়নচণ্ডি । ঢাকাতে ছয় জায়গা ছয়টা বিয়ে করছে। মাস শেষে এক এক বউয়ের কাছে যায়। তাদের থেকে টাকা কড়ি নেয়। আর হোটেলে হোটেলে মেয়ে মানুষ নিয়ে ফূর্তি বিলাস করে। মা গুলো আমার বুড়ি হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু উড়নচণ্ডি আমার থেকেও ইয়াং। এই যে দেখছেন আমার, কেমন জীর্নশীর্ন। আমার বাপ তাগড়া জোয়ান। মা গুলো সবাই জানে লোকটা খারাপ। কিন্তু কিচ্ছু বলতে পারেনা। কারন তারাও তাদের জায়গা থেকে সরেস (ভাল) না। তাই তারা দেখে পনের'শ টাকা দিলেই যদি ল্যাঠা চুকে যায়; কে যাবে অযথা ঝামেলা বাধাতে। যাইহোক আসল কথায় আসি। কথার মাঝখানে চা শেষ করে সিগারেট জ্বালালো। নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো, সংসারে দায়িত্ব নিতে গিয়ে আমার লেখাপড়া আর হলোনা। গ্রামে থাকতে মুরগীর ব্যবসা করতাম। ফাতেমা নামের একটা মেয়ের সাথে আমার ওঠাবসা ছিল। মা-ভাইদের নিয়ে আর ফাতেমার নিয়ে দিনগুলো ভালই কাটছিল। এক এক করে ভাইগুলো লেখাপড়া শিখলো, বড় হলো, ঢাকা শহরে চাকরী করতে এলো, বিয়ে করলো আর আমার থেকে আলাদা হয়ে গেল। যাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আমার যৌবন ফুরালাম, তারা কেউই আমার দিকে তাকালোনা। আমি ফাতেমাকেও হারালাম। ও আমার মুখপানে চেয়ে চেয়ে সাতবছর পাড় করলেও আমি ওর পথ চাওয়ার শেষ করতে পারলাম না। অন্যের ঘরের বৌ

হয়ে আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। আমি কোন রকম কোন বাধায় দিতে পারলাম না। তখন আমার রোজগার একটাকাও না। মা ভিক্ষে করতে শুরু করলো। আমি হয়ে গেলাম কুড়ে। চরম হতাশা যখন পেয়ে বসেছে, তখন দুই একটা বিড়ি খেতে শুরু করলাম। তারপর গাঁজা। বাংলা মদ। আর এখন যা পাই তাই খাই। আগে মা নিষেধ করতো। আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতো। তাই মাঝে মাঝে খেতাম না। এখন মাও নাই। নিষেধও করেনা। বাদও দিইনে। যা পাই তাই খাই। লোকটা চোখ দুটো ছল ছল হয়ে ওঠে যেন এখনই কেঁদে ফেলবে। সিগারেটে গভীর একটা টান দেয়। মুখভর্তি ধোঁয়া কৌশলে ফুসফুসের মাঝে চালান করে দেয়। অনেকক্ষন বাদে তা নাকের ছিদ্র দিয়ে বের করে দেয়। আর মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করার সাথে সাথে তা গোল গোল হয়ে মাথার উপরের দিকে উঠে যেতে থাকে। একদৃষ্টে সিগারেটের দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষন। আমিও অপেক্ষা করছি তার পরবর্তী কথাগুলো শোনার জন্য। হঠাৎ বলতে শুরু করলো, আমি এখন বাসে বাসে কাজ করি। যা আয় ইনকাম হয় তাই দিয়েই পেট চলে যায়। থাকার জাগার কোন চিন্তা নাই। এইযে দেখছেন স্টিডিয়াম, ওর নিচে ছালার উপর শুয়ে থাকি। কুত্তো আমার মাথার দিকে পায়ের দিকে শুয়ে থাকে খুব আরামে। ওদের সাথে আমার মিল কোথায় জানেন? প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় আমার দিকে। উত্তরের তোয়াক্কা না করেই বলতে থাকে, ওরাও বেওয়ারিশ আমিও বেওয়ারিশ। থাকা খাওয়ার কোন ঝামেলা নাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে ঝামেলা কোথায়? ঝামেলা সাহেব ঝামেলার কাছে। কথাটা বলেই একটা বিশ্রী হাসি দিলো। দীর্ঘদিনের না মাজা দাঁতগুলো আরও বিশ্রী দেখা গেল। তারপর নিজে থেকেই বললো, প্রাগৈতিহাসিক গল্প পড়েছেন? আরে ঐযে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের লেখা। আমি খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি গল্প উপন্যাস এইগুলো পড়েন? চোখ পাকিয়ে অহমিকার সাথে লোকটা বললো, পড়বোনা ক্যান? ওগুলো কি শুধু বড় বড় ডিগ্রীধারীদের জন্য বরাদ্দ করা আমরা পড়তে পারিনা? আমি কণ্ঠটা নিচু করে বললাম, আসলে আমি তা বোঝাতে চাইনি। আমি বোঝাতে চেয়েছি আপনি.....। কথাটা শেষ করতে দিলনা বলতে শুরু করলো, ভিখুর যেমন পেটের ক্ষুধা মেটার পর যৌবনের ক্ষুধা এসে হাজির হলো। আমারও তাই হয়। যেদিন আয় রোজকারপাতি ভাল হয় সেদিন আমিও একটা মক্ষীরাণীর খোঁজ করি। তারপর.....। লোকটি থেমে যায়। আমিও কথাটার গভীরে যেতে চাইনা। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললাম, আপনি কোন বাসে কাজ করেন? আল্লাহর দুনিয়ার সব বাসেই আমার কাজ। তবে যেই বাসে ভিড় বেশি সেই বাসে আমার কাজ বেশি। হঠাৎ আমার চোখ পড়লো যাত্রীবোঝাই একটা বাসের দিকে। ভিতরে বাইরে সমপরিমান মানুষ। ঝুলে আছে সব বাদুরঝোলা। সেই বাসে একজন যাত্রী ঝোলার চেষ্টা করছে যাকে আমার খুব পরিচিত মনে হলো। সে আর কেউনা যে আমার সাথে বসে এতক্ষন তার জীবনের কিছু ঘটনা ভাগ করলো। আমি আমার মতো করে আমার চায়ের বিল মিটালাম। মাথার মধ্যে লোকটার কিছু ঘটনার ছবি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। মনে মনে তার ফাতেমার চেহারা মনে করার চেষ্টা করলাম। তার মায়ের মুখ। তার ভাই-ভাইবউদের মুখ। তার মক্ষীরাণীদের আচরন। তার থাকার জায়গা। কুকুরগুলো। ধুলো মাখা প্যাণ্ট। ময়লা জর্জরিত টিশার্ট। উসকো খুসকো চুল। হঠাৎ একটা লোকের সাথে আমার অন্যমনস্কতার জন্য ধাক্কা লাগলো। আমি তার দিকে না তাকিয়েই বললাম, সরি ভাইজান। সেও জবাব দিলো, না না ঠিক আছে ভাই। কণ্ঠটা পরিচিত মনে হলো। পিছন ফিরে তাকালাম দেখলাম সেই লোকটা যেই লোকটার কিছু ঘটনা নিয়ে আমি ভাবছিলাম। বেশ কয়েকটা দশটাকার নোট সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। হাতে একটা দামী মানিব্যাগ। তখন গুলিস্থান মোড়ের পুলিশ বক্সের মাইকে বেজে চলেছেঃ পকেটমার, ছিনতাইকারী, অজ্ঞানপার্টি ও মলমপার্টি এদের থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকুন।

দুজনে

হাবলু চল মাছ মারতি যাই। প্রস্তাব ছুঁড়ে দেয় আলাল। কথাটা মন্দ না। আজতো শুক্রবার ইস্কুল ছুটি অতএব যাওয়া যায়। চল যাই। আলালের সাথে করে কেঁচো খুঁড়তে বেরোয় দুজন। মাছের প্রিয় হলো লাল কেঁচো। দেখতে ভাল হতে হবে। না হলে তিঁনিরা খাননা। এমনিতেই আলালের সাথে মাছ ধরে পারেনা হাবলু। এর জন্য খুবই কষ্ট হয় হাবলু'র। কারণ আলাল দেখতে খুবই বাজে। নাক দিয়ে নস্যি পড়ে আর তার দাগ কালো কালো হয়ে স্পষ্ট।

অথচ হাবলুর গায়ের রং ফর্সা। স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে হাঁটাচলা ফেরা করে। বড়দেরকে সম্মান দেয়। লেখাপড়ায় ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়। অথচ মাছ ধরার ক্ষেত্রে; নাহ আলালের সাথে পারা যায়না। এসবই ভাবছে আর হাঁটছে হাবলু। খানিক বাদে কেঁচো সংগ্রহ করে গ্রামের খালের দিকে রওনা দেয় দুজন। খালের উপর ছোট্ট একটি কালভার্ট তার উপর বসে আছেন কাশিনাথ দাদা। লোকটার ছেলের নাম আমজাদ। কিন্তু সে কাশিনাথ কি করে হয় মাথায় ঢোকেনা হাবলুর। কারণ কাশিনাথ নামটা হিন্দুদের মতো শোনায়। তবুও ছোটবেলা থেকে শুনতে শুনতে কান পেকে গেছে ওদের। এই লোকটিকে মোটেও ভাল লাগেনা হাবলুর। কারণ যেদিনই মাছ ধরতে যাক সেদিনই কাশিনাথ দাদা বলে, দেহিস আজও বড় মাচটা আলালই পাবি। এই কথাটা শোনার সাথে সাথে হাবলুর মনে হয় বুড়াটাকে ধাক্কা দিয়ে খালের মধ্যে ফেলে দেয়। কিন্তু পারেনা স্যার আর মা-বাবার কথার জন্য। বইতে পড়েছে, স্যার বলেছে, মা-বাবা বলেছে। বড় হতে হলে বড়দের সম্মান আর ছোটদের আদর দিতে হবে।

হাবলু মনে মনে আল্লাহ ডাকে, হে আল্লাহ আজ আমার বর্শিতে একটা বড় মাছ ধরায়ে দিও তাহলে মসজিদে গিয়ে আজই পাঁচশিকির সিন্নি দিবো। দুজন গিয়ে পাশাপাশি বসে। বর্শি ফেলার সাথে সাথে আলালের বর্শির নল তল করিয়ে নিয়ে যায়। ওমনি টান হেইয়ো। উঠে এলো একটা তাজা লকলকে মাগুর মাছ। আহ কি তার চেহারা! ময়লা দাঁত বের করে হাঁসতে থাকে আলাল। তা দেখে গায়ে আগুন লেগে যায় হাবলুর। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে আর বলতে থাকে, ওহে মাছ পাইচো, মাছ পাইচো। দাঁতে কেলানোর কি হয়চে? শালার দাঁত দেখেছো; দাঁতে কি ময়লা। তা শুনে আলাল আরও খুশি হয়ে বলতে থাকে, আরে চেহারা দেখে মাছ বর্শির কাছে আসেনা হে। মানুষ চিনে আসে। একথা শোনার সাথে সাথে হাবলু রাগে, দুঃখে, অপমানে মাটির সাথে মিশে যেতে থাকে। তবুও আর কোন কথা বলেনা। মনে মনে একটি বাক্য পাঠ করে চলেছে, হে আল্লাহ একটা বড় মাছ আমার বর্শিতে তুমি গেঁথে দাও আজই মসজিদে গিয়ে তোমার নামে পাঁচ শিকির সিন্নি করবো। কিন্তু মাছ ধরেনা ওর বর্শিতে। ইতোমধ্যে আলাল আরও দুইটা মাছ পেয়ে যায়। সেগুলো অবশ্য উল্লেখযোগ্য বড় না। তবুও হাবলু জ্বলছে। তার বর্শিতে একটাও মাছ ওঠেনি। রাগ করে বর্শির ছিপগুলো ভেঙ্গে খালের মধ্যে ফেলে দিয়ে বদনাটা নিয়ে বাড়ী চলে আসে হাবলু। সাবান দিয়ে ভাল করে গোসল করে মসজিদে নামাজ পড়তে যায় বাবার সাথে। কিন্তু মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে থাকে ওর। নামাজ শেষে ছোট্ট হাত দুটি আল্লাহর দরবারে তুলে বলে, হে আল্লাহ তুমি আমার বর্শিতে একটা বড় মাছ গেঁথে দিও আমি সামনে শুক্রবার তোমার নামে পাঁচশিকির সিন্নি দিবো।

পরের শুক্রবার হাবলু যত্ন করে বর্শির ছিপ কাটে সোজা ও চিকন দেখে বাঁশের কঞ্চি। যত্ন করে বর্শি গাথে সূতার সাথে। তারপর তাজা তাজা কেঁচো সংগ্রহ করে আলাদা একটা জায়গা থেকে। যা আলাল জানেনা। সব গোছানো শেষ হলে একা একা রওনা দেয় মাছ ধরতে। পথমধ্যে দেখা হয় আলালের সাথে। আলাল বলে আজও তুই মাছ পাবিনে। চোখ রাঙিয়ে আলালের দিকে তাকায় হাবলু। তা দেখে আলাল বলে - আসলে মাছ লোক চেনে বুজলি। কারণ তোরে পরিবারের কেউ কোনদিন মাছ ধরে নাই। খালি মাছ কিনে কিনে খায়ছে। আর আমার দাদার দাদা তার দাদা, আমার বাপ তার বাপ তার বাপরা ছিল জালে(জেলে)। তাই মাছ আমার গার গন্দ শুঁকেই চলে আসে। কথাগুলো বলে হো হো করে হেসে ওঠে আলাল। হাবলু তার জবাবে বলে, দেখিস আজ মাছ পাবোই পাবো। আচ্ছা দেকা যাবিনি। চল আগে। আলাল হাবলুর কথার জবাব দিয়ে পথচলা শুরু করে। নিয়মিত ভাবে দেখা হয় কাশিনাথ বুড়োর সাথে। আজ হাবলু অন্য পথ দিয়ে গেল। কারণ আজ ও বড় মাছ পাবেই পাবে। তাই কাশিনাথ বুড়োর সামনে দিয়ে গেলনা। নির্ধারিত জায়গা দুজন বসে গেল। আর ধারাবাহিক ভাবে আলাল একটা বড় পুঁটি পেয়ে গেল। এই পুঁটিকে জাপানি পুঁটি বলা হয়। বেশ বড়সড়। আলাল তার দাঁত বের করে হাঁসতে লাগলো। আর হাবলু রাগে ফুলতে থাকলো আর একদৃষ্টিতে বর্শির নলের দিকে তাকিয়ে রইলো। হাবলুকে চুপ থাকতে দেখে আলাল বললো, বুজলি হাবলু,

তোর বর্শিতে মাছ ধরবিনানে। ক্যা? প্রশ্ন করে আলালের দিকে তাকালো হাবলু। আর আলাল খুব মনোযোগ সহকারে বর্শিতে কেঁচো গাঁথতে গাঁথতে বললো, তুই এই বর্শির ছিপ কাটিছিস লতিফ বুড়োর বাগান থেকে না? হ্যাঁ বলল হাবলু। তা শুনে আগের মতো বর্শির কেঁচোতে থু থু লাগাতে লাগাতে বললো, দ্যাখ লতিফ বুড়োর তো কোন ছাওয়াল-পল নাই। যার কয় হাটকুঁড়ে(আটকুড়ে)। আর হাটকুঁড়ে লোকের বাগানের কঞ্চিতে ছিপ বানালি আর দরবেশের মতো আর হাটকুঁড়ের ফাঁসের গাদিরতে কেঁচো আনলি কি মাচ বাধে? কথা শেষ করে আবার হাসতে লাগলো আলাল। সব কথা গুলো শুনে হাবলু খুব রেগে যায় কিন্তু খুব কষ্টে তা সংবরণ করে আর আল্লাহর কাছে মিনতি করে, হে আল্লাহ আমার বর্শিতে একটা বড় মাছ গেঁথে দাও, আমি তোমার নামে মসজিদে পাঁচশিকির সিন্নি দেবো।

বসে থাকতে থাকতে কাঁন্না পায় হাবলুর। জুম্মার আজান দিলো গ্রামের মসজিদে তা শুনে আলাল বললো, হাবলুরে, নামাজ পড়তি যাবিনে? যাবো কি যাবোনা তুমার কাছে কি আমার শুনতি হবি? হাবলুকে রাগতে দেখে হাফপ্যাণ্টের পকেট থেকে বিড়ি আর ম্যাচ বের করে আলাল। হাবলুর দিকে তাকিয়ে বলে, কিরে দিবি নাহি একটান। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে হাবলু বলে, শালা তুই খাচ্ছিস না। কাল স্যারের কাছে কয়া তোর মা'র খাওয়াবো। শালার গাওদে সারাদিন কেঁচো কেঁচো গন্দ কয়। বিড়ি খায়। দাঁত মাজেনা। পিচেট (পিশাচ) কোনকার। কথাগুলো শুনে আলাল আগের মতো করেই হাঁসতে থাকে যেন হাবলু ওর গুণকীর্তন করছে। এবার রাগটাকে দমাতে না পেরে আলালকে মারার জন্য উদ্যত হয়। আর ওমনি আলাল মাছের বদনাটা নিয়ে বর্শিগুলো ফেলে রেখে দৌড় দেয়। এবার শান্ত হয়ে বসে হাবলু। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, আজ মাছ ধরেই তবে সে বাড়ীতে যাবে। মাছটা ধরে নিয়ে সে কাশিনাথ বুড়োকে দেখাবে আর বলবে শুধুমাত্র আলালই না আমিও পারি মাছ ধরতে।

দুপুর থেকে বিকাল, বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। কিন্তু হাবলুর বর্শিতে দুই তিনটা চিংড়ি আর ছোট ছোট পুঁটি ছাড়া আর কিছু উঠেনা। সন্ধ্যার আজান দেবে দেবে এমন সময় বর্শির নলটাকে খুঁজে পায়না হাবলু। দেখতে পায় খুবই জোরের সাথে বর্শির ছিপসহ চলে যাচ্ছে পানির মধ্যে। তা দেখে খুবই খুশি হয় হাবলু। এই বুঝি বড় মাছ পেয়ে গেল। বর্শির ছিপ হাতে ধরলো এবং আলগোছে টানদিল। কিন্তু মাছ উঠেনা। মনে পানির নিচে কোথাও কোন কিছুর সাথে আটকে গেছে বর্শি। তাই হাবলু মনে মনে ভাবতে থাকে, যদি পানির নিচে গিয়ে দেখে ইয়া বড় এক বোয়াল মাছ গেঁথে আছে। তাহলে তো দারুন ব্যাপার ঘটে যাবে। কাশিনাথ বুড়োকে দেখাবো আর বলবো এই দ্যাখ, আলাল এতদিন ধরে মাছ ধরছে অথচ এত্তোবড়ো মাছ কোনদিন ধরতে পেরেছে? পারে নাই। কাশিনাথ বুড়ো বেশ খুশি হবে। মা-ও খুব খুশি হবে। আব্বাও বকবেনা মাছ ধরার জন্য। আলালকেও বলতে পারবো, দ্যাখ মানুষের মনে দুঃখ দিয়ে কোন কথা বলতে নেই। লতিফ বুড়ো হাটকুঁড়ে হোক যাইহোক, দরবেশ যাইহোক, মানুষ মানুষই। মানুষ হয়ে মানুষকে খারাপ বলতে নেই।

এসব ভাবতে ভাবতে হাঁটু পানিতে নেমে গেল। নাগাল পেলনা বর্শির। তারপর কোমড় পানি। তবুও নাগাল পেলোনা। গলা পানিতে যাওয়ার পর ডুব দিলো হাবলু। যদিও সন্ধ্যা ভয় ভয় লাগছে। কিন্তু বড় মাছের লোভে সব ভয়কে জয় করেছে হাবলু। একডুব হলোনা। দুইডুব তবুও পারলোনা। তিনডুব, চারডুব, পাঁচডুব, ছয়ডুব অত:পর সাতডুবের মাথায় সবসুদ্ধ তুলে আনলো হাবলু। নাহ কোন মাছের কোন আঁইশ পর্যন্ত পেলনা হাবলু। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আর ভাবলো সবাইকে দেখানোর কথা বললাম কিন্তু সিন্নি দেওয়ার কথা বললাম বলেই বোধহয় মাছটা পেলাম না। তবে ভাল লাগছে এটা ভেবে যার সাথে বর্শি বেধে ছিল, সেটা হেঁচকা টানে তুলে এনেছে হাবলু। তবে বেশ ভারি ভারি আর লম্বা লম্বা লাগছে। বিষয়টি কি বাড়ী গিয়ে দেখতে হবে। তাই হাবলু তাড়াতাড়ি পা চালালো।

চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। যতদ্রুত সম্ভব পা চালিয়ে খুব কষ্টে জিনিসটাকে বাড়ীতে আনলো। তবে কাউকে দেখতে দেওয়া যাবেনা। বাড়ীতে অতি সন্তর্পনে প্রবেশ করলো হাবলু। বদনাটা খুব সাবধানে রেখে গোয়াল ঘরের দিকে চলে গেল। কারণ গোয়াল ঘরে খড়ের গাদার মধ্যে পলানটুকটুক(লুকোচুরি) খেলার জন্য একটা জায়গা বানিয়েছে হাবলু। একবার লুকালে আর কেউ খুঁজে পায়না। সেখানে গিয়ে জিনিসটাকে খুব যত্ন করে রাখলো। কারণ এখানে রাতের বেলা কিছুই দেখা যাবেনা। আবার কোন আলো নিয়ে এসেও দেখা যাবেনা। কারণ খড়ের গাদায় আগুন লেগে গেলে সর্বনাশ। অবশ্য বাবার কাছ থেকে টর্চলাইটটা নিলে দেখা যায়। কিন্তু বাবা তো হাট থেকে আসবে মেলা (অনেক) রাত্রে। অতএব রাত্রে সম্ভব না।

কিন্তু দেখতে না পেলেও তো ঘুম আসবেনা। কি করা যায় ভাবতে থাকে হাবলু। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এলো, আজ রাত জেগে পড়বে আর বাবা এলে তাঁর থেকে লাইট নিয়ে এসে দেখবে। যা ভাবা তাই কাজ। খড়ের গাদা থেকে বের হয়ে এসে সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসলো। তা দেখে হাবলুর মা খুব খুশি। যদিও হাবলু ক্লাসের ফার্ষ্টবয়। তবুও কখনও সন্ধ্যায় পড়তে বসেনা। কিন্তু আজ পড়তে বসা দেখে হাবলুর মা কাছে গিয়ে বললো, কি ব্যাপার আজ আমার বাপ সোনার কি হয়েছে যে পড়তে বসলো? মুখটা লজ্জায় লাল করে অন্য দিকে তাকিয়ে হাবলু বললো, এমন ভাবে কথা বলছো যেন আমি কখনো পড়িনা। না তা বলছিনা। আচ্ছা তুমি পড়ো বাবা সোনা। কথাটা বলেই হাবলুর মা চলে গেল। পড়তে পড়তে কাহিল হয়ে গেল হাবলু কিন্তু ওর বাবা আর আসেনা। ওর মা খাওয়ার জন্য ডেকেছে তবুও খেতে যায়নি। হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে গেছে টের পায়নি হাবলু।

পরে যখন ঘুম ভাঙলো দেখলো বাড়ীতে বেশ হুলুস্থল ব্যাপার। অনেক লোকজনের সমাগম। কিছুই বুঝতে পারছেনা। হাবলুর বাপ-চাচাদের বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। গ্রামবাসী অনেকেই এসে জুটেছে ওদের বাড়ীতে। শুধু তাই-ই না থানা থেকে পুলিশ পর্যন্ত এসেছে। দুচোখ কচলিয়ে সবকিছু বুঝে নেবার চেষ্টা করে হাবলু। দেখলো বাহির বাড়ীতে কাচারী ঘরে বিরাট এক মজলিশ। যেখানে উচ্চস্বরে কথা বলছে দারোগা। প্রিয় গ্রামবাসি, গ্রামের মধ্যে কিছু সন্ত্রাসী প্রবেশ করেছে। যাদের কাছে অবৈধ অস্ত্র আছে। তারা যেকোন সময় একটা হট্টগোল পাকাতে পারে তাই আপনারা সাবধান থাকবেন। আর খেয়ালে খেয়ালে থাকবেন যদি কোন অপরিচিত লোকদেরকে সন্দেহজনক ভাবে ঘুরাফেরা করতে দেখেন তাহলে পশ্চিমপাড়া ওয়াপদা ঘরে আমরা সিভিল পোশাকে থাকবো আপনারা আমাদের খোঁজ দেবেন আমরা তাদেরকে পাকড়াও করবো। আর হ্যাঁ, আপনারা যদি আমাদের সার্বিক ভাবে সাহায্য করেন তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। কোন ভয় পাবেন না। আমরা আছি আপনাদের সাথে।

যা বোঝার বুঝে নেয় হাবলু তার মতো করে। পরেরদিন তাড়াহুড়ো করে ঘুম থেকে উঠে চলে যায় গোয়াল ঘরে খড়ের গাদায়। চুপি চুপি সেই ভারী জিনিসটি খড়ের গাদা থেকে বের করে। খুব যত্নে রাখা পলিথিনে মোড়ানো। আস্তে আস্তে সেই পলিথিন খোলে হাবলু। পলিথিনের পর আর কালো কাপড় পেচানো। তারপর আবার পলিথিন। আবার কালো কাপড়। এবার খবরের কাগজে মোড়ানো। কাগজ খুলতেই চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় হাবলুর। আরে বাস! এতো সিনেমাতে দেখা যায় সন্ত্রাসীদের হাতে থাকে। যাকে বলে বন্দুক। আবার ছয়টা গুলিও আছে। বুকের মধ্যে কেমন যেন ছ্যানাৎ করে ওঠে। আবার যেরকম ছিল সেরকম করে জড়িয়ে রেখে দিল খড়ের গাদায়। গোসল করে খাবার খেয়ে স্কুলের দিকে রওনা দিল হাবলু। পথের মধ্যে দেখা হয় আলালের সাথে। আলালকে দেখে হাবলু বলে, কি রে স্কুলে যাবিনা? নারে আজ মাচ মারবো ম্যালা । তুই যা ঘুরে আয়। আজ মাচ বিক্রি না করলি খাবার নাই। ও আচ্ছা। তোর সাথে আমার অনেক কথা আছে। হাবলু বলল। কি কতারে? জিজ্ঞাসা করলো আলাল। হাবলু বলল, আগে স্কুল থেকে আসি তারপর বলবো।

হাবলু স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখলো আলালদের বাড়ীতে মানুষের ভীড়। একপা দুপায়ে এগিয়ে গেল হাবলু। দেখলো, আলালের ভাই দুলালকে ওর মা মাথায় পানি দিচ্ছে আর কাঁদছে। তা দেখে হাবলু আলালের কাছে গিয়ে বলল, আলাল কি হয়েছেরে? তোদের বাড়ীতে এতো লোকজন ক্যাঁন? তখন আলাল বলতে থাকে, তুই স্কুলে যাওয়ার পর আমি আর দুলাল মাছ মারতি যাই। আমি যেনে বসি সেনে আমিই বইছিলাম। আর তোর জাগা দুলালের বসাইছিলাম। হঠাৎ দুডে লোক আসে দুলালের বর্শি ভাঙ্গে ফেলে পানির নিচে কি যিনি খুঁজতিছিল। না পায়ে আমার আর দুলালের ধরে কি মারা মারলো। কথাগুলো বলে আলাল কাঁদতে লাগলো। আবার বলতে শুরু করলো, আমারতো খালি মারেছে কিন্তু দুলালকে মাথার উপর তুলে আছাড় মারেছে। ডাক্তার কয়ছে ওর নাকি কোন হাড় ভাঙ্গে যাওয়ার মতো হয়া গেছে। কথাগুলো খুব মনোযোগ সহকারে শুনে হাবলু আলালকে বললো, আচ্ছা ঐ লোকগুলোর দেখলি তুই চিনতি পারবিনি? হ্যাঁ পারবোনে। আয় আমার সাথে বলে ডেকে নিয়ে গেল আলাল কে। দুজন মিলে যুক্তি পরামর্শ করলো। কিভাবে কি করা যায়? সিদ্ধান্ত নিল দুজন এমন, লোকগুলোকে দেখার সাথে সাথে তারা পশ্চিম পাড়া দৌড়ে চলে যাবে পুলিশের কাছে। আলাল যাবে খবর দিতে। আর হাবলু জামগাছে উঠে তাদের দিকে নজর রাখবে। যা ভাবনা সেই মতো দুজনে প্রস্তুতি নিয়ে থাকলো।

পরের দিন স্কুল থেকে ফেরার পথে হাবলু আর আলাল দেখলো দুজন লোককে তাদের পাশ দিয়ে খুব জোরে পা চালিয়ে তাদের খালের দিকে যেতে। তা দেখে হাবলু আলালকে বললো, এই আলাল দেখতো এই দুজনকে তুই চিনতে পারিস কিনা। আলাল ভাল করে লক্ষ্য করে কেঁদে ফেলল এবং বলল, হ চিনতি পারিছি ঐযে কালা লোকটা দুলালের ধরে আছাড় মারিছিল। তাহলে তুই যা। যায়ে পুলিশকে ডেকে আন। আলাল বলে, আমার কতা কি পুলিশ বিশ্বাস করবিনি। তারচে বরং তুই যা সব গুছায়ে কতি পারবিনি। আচ্ছা। বলেই হাবলু দৌড় দেয়। পাঁচমিনিটের মধ্যে পশ্চিমপাড়া পৌঁছে যায় ও। পুলিশকে আদ্যোপান্ত সব বলে। কথাগুলো শুনেই মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ সদলবলে চলে আসে খালের ধারে। তা দেখে আলাল জামগাছ থেকে নেমে আসে। পুলিশ দেখেই দৌড়ে পালাতে চায় লোক দুটি। কিন্তু চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলে পুলিশ। ততক্ষনে আলাল গিয়ে গ্রামের সমস্ত লোকদের ডেকে আনে। গ্রামের লোকজন সবাই হাবলু আর আলালকে কাছে টেনে নিয়ে অনেক দোয়া ও আদর দিতে থাকে। কেউ কেউ বলে, অনেক সাহসের পরিচয় দিয়েছে আমাদের হাবলু আর আলাল। হাবলুর বাবার চোখ খুশিতে ঝকমক করে ওঠে। পুলিশ অফিসার হাবলুকে ডেকে বলে, তো বাবা যাও তোমার সেই পলিথিনের মধ্যে কালো কাপড়ে পেঁচানো কি যেন জিনিসটি নিয়ে আসো সবাইকে দেখাই। আচ্ছা বলেই দৌড় দেয়। পুলিশ অফিসারসহ গ্রামবাসী হাবলুর পিছু পিছু যেতে থাকে। হাবলু তার সেই গোপন জায়গা থেকে পলিথিনের মধ্যে কালো কাপড়ে পেঁচানো অস্ত্র বের করে আনে। তা দেখে গ্রামবাসীর চোখ ছানাবড়া। অবাক হয়ে সবাই দেখে হাবলুকে। সে আজ গ্রামের নতুন নায়ক। সবাই সিনেমাতে দেখেছে দুঃসাহসিক কাজ। কিন্তু আজ সবাই স্বচোখে বাস্তবে দেখছে। অস্ত্র ও সন্ত্রাসী নিয়ে পুলিশের দল চল গেল। যাওয়ার সময় পুলিশ অফিসার হাবলু আর আলালকে স্যালুট করে গেল এবং বলে গেল খুব শীঘ্রই পুরস্কার দিতে আসবে। পুলিশরা চলে যাওয়ার পর গ্রামবাসী হাবলু আর আলালকে কাঁধে তুলে নিয়ে মিছিল শুরু করলো। আনন্দে হাবলু আর আলালের চোখে পানি চলে এলো।

সাতদিনের মাথায় পুলিশের দল হাবলু আর আলালের স্কুলে এসে উপস্থিত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামবাসী স্কুলে এসে উপস্থিত হয়ে গেল। প্রথমে আলোচনা অনুষ্ঠান তারপর শুরু হলো পুরস্কার বিতরণের পালা। হাবলু'র বুকের মধ্যে ঢিবঢিব শুরু হয়ে গেল। পুরস্কারস্বরুপ বিশহাজার টাকা ও একটি করে মেডেল দেওয়া হলো দুজনকে। এবার মাইকে কিছু বলার জন্য হাবলুকে ডাকা হলো। হাবলু কাঁপতে কাঁপতে কথা বলা শুরু করলো—আমার আজকের পুরস্কারের টাকা আমি আলালকে দিয়ে দিলাম। ওর ছোটভাইয়ের চিকিৎসা করবে। তবে একটা শর্ত আছে। একথা শুনে পুলিশ অফিসারসহ সবাই প্রশ্নাতুর চোখে হাবলুর দিকে তাকালো। তা দেখে হাসিমুখে হাবলু বললো, আলাল সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং আমার সাথে নিয়মিত স্কুলে আসবে। ও আর মাছ ধরে বিক্রি করবেনা। এই পুরস্কারের টাকা দিয়ে ওর আব্বু ব্যবসা করবে আমার আব্বুর মতো। একথা শোনার সাথে সাথে উপস্থিত সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। প্রধান শিক্ষক সাহেব তাঁর জায়গা ছেড়ে এসে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি দীর্ঘজীবি হও বাবা।

তারপরের ঘটনা দ্রুত ঘটে যায়। আমুল পরিবর্তন আসে আলালের মধ্যে। দুজনে মিলেমিশে স্কুলে যায়। আলাল আগের মতো নোংরা কাপড় চোপড় পরে থাকেনা। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। তবে দুজনের মাঝে শুধু একটি পরিবর্তন আসেনি। তাহলো শুক্রবার মাছ ধরতে যাওয়াটা। এখনও আলাল বড় মাছটাই পায়। দুজনের মিলে অনেক আনন্দ করে একেকটা মাছ পেয়ে। কিন্তু হাবলু মনে মনে এখনও আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে, হে আল্লাহ আমার বর্শিতে একটা বড় মাছে গেঁথে দাও। আমি পাঁচ শিকির সিন্নি দেব।